সত্যবাক

১৩তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ★ জুলাই-অগাস্ট, ২০২১ ★ E-mail- satyabaakwb@gmail.com

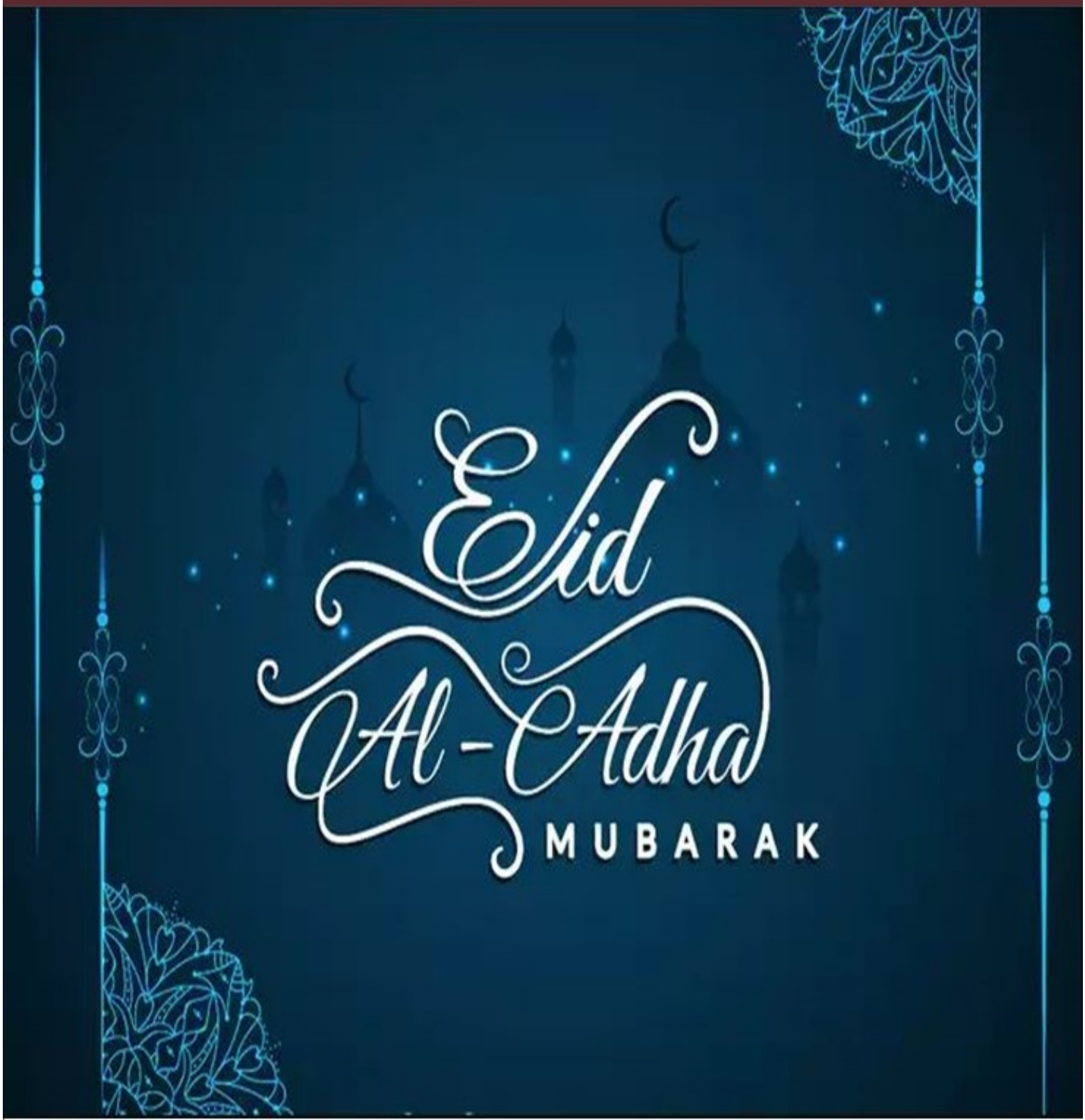

আল কুরআন

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۷﴾

"এগুলোর (কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না,কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন,যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে,তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দিন।" (সুরাহ হাজ্ব ৩৭)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿6:162﴾

(হে রাসূল) বলুন: 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে নিবেদিত। [সূরা আন'আম: ১৬২]

আল হাদিস

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার (রহঃ) ... বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের এ দিনে আমরা সর্ব প্রথম যে কাজটি করবো তা হল সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করবো। এরপর ফিরে এসে আমরা কুরবানী করবো। যে ব্যাক্তি এভাবে তা আদায় করল সে আমাদের নীতি অনুসরণ করল। আর যে ব্যাক্তি আগেই যবাহ করল, তা এমন গোশতরুপে গন্য যা সে তার পরিবার পরিজনের জন্য আগাম ব্যবস্থা করল। এটা কিছুতেই কুরবানী বলে গন্য নয়। তখন আবূ বুরদা ইবনু নিয়ার (রাঃ) দাঁড়ালেন, আর তিনি (সালাতের) আগেই যবাহ করেছিলেন। তিনি বললেনঃ আমার নিকট একটি বকরীর বাচ্চা আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাই যবাহ কর। তবে তোমার পরে আর কারোর পক্ষে তা যথেষ্ঠ হবে না।

মুতাররাফ বারা (রাঃ) থেকে বর্ননা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি সালাতের পর যবাহ করল তার কুরবানি পূর্ন হলো এবং সে মুসলিমদের নীতি পালন করলো।

--সহীহ বুখারী- কুরবানী অধ্যায় – হাদিস নম্বর- ৫১৪৭ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য কথা বল।"
— আল কুরআন (৩৩-৭০)

"জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ।"
— নাসায়ী-৪২২০

সত্যবাক

বর্ষ - ১৩, সংখ্যা - ৩

জুলাই - আগস্ট, ২০২১

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪০

➪মুখ্য সম্পাদক - নুর ইসলাম

➪সম্পাদক - সাবের বিন সেখ ইয়াসিন
(8918734921)

➪সার্কুলার ম্যানেজার- আরজাউল হক
(9635779370)

এডিটোরিয়াল বোর্ড

➦মোহা রিজওয়ান হোসাইন
➦আলী হাসান সরকার
➦মোহা হাসিমুদ্দিন
➦সউদ হাসান
➦মসিউর রহমান

মূল্য - ২০ টাকা

সূচিপত্র

পাঠকের কলম ২

সম্পাদকীয় ৩

মাসজিদুল আক্বসা- ইসলামী ঐক্যের প্রতীক

কুরআনের পয়গাম ৪

কুরবানীঃ আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
✍আবু আব্দুল্লাহ

হাদীসের পয়গাম ৬

প্রকৃত প্রশান্তি ✍মাওঃ খলিলুর রহমান মুমিন

ঈমান ও আক্বিদাহ ৮

নিশ্চিত সফল মুমিনের গুণাবলী
✍আবদুল্লাহ মিসবাহি

প্রবন্ধ ১২

ফিলিস্তিন ইজরাইল সংঘাতঃ কী, কেন এবং...
✍আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

কুরবানী তোমারে করেছি কুরবানী
✍ মোহাঃ হাবিবুল্লাহ

ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব কি শুধু আলেমদের?
✍ মুহাঃ হাসিমুদ্দিন

বিশেষ প্রবন্ধ ২১

ইসলামী আন্দোলন ও ক্যারিয়ার
✍মুরশিদ আলী

ইবাদাত ২৮

হজ্ব ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ ✍ মসিউর রহমান

ইতিহাসের পাতা ৩০

স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহীদ শের আলি খান
✍ নয়ন চৌধুরী

বোনেদের পাতা ৩২

বর্তমান সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের ভূমিকা
✍ জাসিয়া খাতুন

বোন তুমি পর্দা করো... ✍ মারিয়াম...

কারওয়ানে উকাবদের পাতা ৩৬

কবিতা-কানন ৩৭

বিশ্ব জাহান ৩৮

সংগঠন সংবাদ ৩৯

পাথেয় ৪০

স্বত্বঃ IYF

ইসলামিক ইয়ুথ ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে মোহা আলামগীর হোসাইন কর্তৃক ৩বি ক্রিসেন্ট এপার্টমেন্ট ৩য় তল, হাতিয়াড়া, কোলকাতা ৭০০১৫৭ থেকে প্রকাশিত।

e-mail: satyabaakwb@gmail.com, web: https://bengali.iyfindia.org

পাঠকের কলম

সম্মানীয় সম্মাদক

আসসালামু আলাইকুম, আমি একজন প্রাক্টিসিং মুসলিম, গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। সত্যবাকের সাথে যুক্ত সমস্ত কর্মীদের সাধুবাদ জানাই, আল্লাহ আপনাদের পরিশ্রম কবুল করুক। তবে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে আমি সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

প্রথমত, সত্যবাকের উদ্দেশ্য কি ? এটা কি শুধু সাংগঠনিক ম্যাগাজিন? না কি ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে মুসলিম যুব-সমাজের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত? যদি সাংগঠনিক ম্যাগাজিন হয় তবে বেশি কিছু আমার বলার নেই, আর যদি যুব সমাজের উদ্দেশ্যে হয় তবে নিম্নলিখিত পয়েন্ট গুলি সত্যবাকের মধ্যে সংযোজন করা সময়ের দাবি বলে মনে করছি...

১) প্রথম পেজে ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার গুলির উল্লেখ করা। এর ফলস্বরূপ যুব সমাজের মধ্যে "সংগঠন", "মাদ্রাসা" নিমিত্তে "NIA", "অভিভাবক" এর ভয় ভীতি কমবে।

২) যুবসমাজের জন্য ম্যাগাজিনে মুখরোচক বিষয়বস্তু দিয়ে প্রলোভন তৈরি করা। দ্বীনি টপিক এর পাশাপাশি এমন কিছু টপিক সংযোজন করা প্রয়োজন যার ফলে ছাত্র-যুবরা সত্যবাক ক্রয়ের জন্য মুখিয়ে থাকবে। যেমন - কেরিয়ার গাইড, জিকে, ইলুমিনাতি কনসেপ্ট, চলমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও ফিৎনা, মধ্য প্রাচ্যের সমস্যা, মুসলিম বীরদের জীবন কাহিনী, ভারতীয় অর্থনীতি যা, দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে যেমন কর ব্যবস্থা, GST, GDP, MGNREGA ACT, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের যোজনা এবং প্রকল্প, সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার সমূহ এবং এগুলি খন্ডন হলে "রিট জুরিকডিকশন" এর পদ্ধতি, RTI ACT এর আলোচনা ইত্যাদি।

৩)যুবসমাজের জন্য চলমান পরিস্থিতির উপর "প্রশ্ন-উত্তর" সিরিজ সংযোজন করা।

৪) ম্যাগাজিন সম্পাদনার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা।

৫) সম্ভব হলে প্রত্যেক মাসে সংকলন করা এবং পেজ সাদাকালোর পরিবর্তে রঙিন করা।

মেজরিটি মুসলিম যুবসমাজ দ্বীনি জ্ঞানলাভের পরিবর্তে কেরিয়ার গঠন কে বেশি প্রাধান্য দেয়। আমার স্বল্প জ্ঞান থেকে এসব সংস্কারের দাবি জানালাম। ইনশাআল্লাহ দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া সহজ হবে।

ইতি

মামুদ রানা

কৃষ্ণনাথ কলেজ প্রাক্তনী (জুলজি ডিপার্ট:)

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমি একজন সত্য অনুসন্ধানকারী/Fact Finder। আমি বহুদিন ধরেই কুরআন এবং সহী হাদীসের আলোকে একটা ইসলামিক সংস্থার খোঁজে ছিলাম। আলহামুদলিল্লাহ–সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ কুরআন এবং সহী হাদীসের আলোকে চলমান ISLAMIC YOUTH FEDARATION কে দেখে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত গর্বিত। এই সংস্থার মুখপত্র সত্যবাকে প্রকাশিত প্রায় সব আর্টিকেলই মানুষের মনকে প্রভাবিত করার মতো।

কিন্তু আমি দেখেছি এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় সব আর্টিকেলের লেখকের QUALIFICATION সম্পর্কে সংক্ষেপেও বর্ণনা থাকেনা।

মানুষের সাইকোলজি হচ্ছে যখনই সে কারো সম্পর্কে ভালো কোয়ালিফিকেশন দেখে অথবা কোনো বিখ্যাত বাক্তির নাম শুনে বা পড়ে তখন সে তাকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করে - মানে সেই বিখ্যাত বাক্তিটি কি বলতে চেয়েছেন তার উপদেশ মানার চেষ্টা করে।

যেমন ধরুন, একজন লোকের মা এর হার্ট অ্যাটাক করলো। তখন সাধারণ একজন লোক এসে তাকে বেশ কিছু উপদেশ দিল।

এখন সেই লোক কি তার কথা শুনবে নাকি সেই লোকের কথা শুনবে যে লোক পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো হার্ট বিশেষজ্ঞ? একজন সাধারণ লোকের হার্ট সম্পর্কে কোনো ধারণায় নেই। অন্যদিকে একজন হার্ট বিশেষজ্ঞ জানেন হার্ট এর কোন সমস্যার কারণে কি হয়? এমতবস্থায় সেই লোক সাধারণ লোকের উপদেশ মানবে নকি হার্ট বিশেষজ্ঞ এর উপদেশ মানবে। খুবই সাভাবিক, লোকটি যেহেতু জানেন হার্ট বিষয়ে সেই ডাক্তার খুবই বিখ্যাত সবাই তার প্রশংসা করে-তাই তার কাছেও তার কথাগুলো সঠিক বলে মনে হবে।

সুতরাং, শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশইয়ের নিকট যদি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানের ক্ষুদ্র কথা গুলো ভালো মনে হয় তবে একটু দেখবেন।

FACT FINDER (সত্য অনুসন্ধানকারী)
RINTU SK
ALIAH UNIVERSITY
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
MASTER OF SCIENCE (2020)
CURRENTLY PURSUING BED FROM WBUTTEPA

মাসজিদুল আকসা- ইসলামী ঐক্যের প্রতীক

সম্পাদকীয়

'আল কুদস' বা 'মাসজিদুল আক্বসা' বা 'বাইতুল মুক্বাদ্দাস' হল ফিলিস্তিনের জেরুলজালেমে অবস্থিত পবিত্র মাসজিদ। এটি মুসলিম ঐক্যের অন্যতম প্রতীক। এটি বিশ্ব মুসলমানদের নিকট সদা সম্মানিত, রাসুল (সঃ) ক্বাবা শারীফ থেকে মাসজিদুল আক্বসায় মিরাজের রাত্রে প্রথম সফর করেন।

প্রিয় নাবী (সঃ) মিরাজ গমনের সময় এ মাসজিদে সমস্ত নাবী ও রাসুলদের ইমামতি করে নামাজ আদায় করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি 'ইমামুল আম্বিয়া' বা সব নাবী রাসুলের সর্দার হিসাবে স্বীকৃত হন। এ এলাকা অসংখ্য নাবী রাসুলের স্মৃতিবিজড়িত এবং এর আশে পাশে অনেক নাবী রাসুলের কবর রয়েছে। এটি ওহী অবতরণস্থল, ইসলামের অন্যতম কেন্দ্র, ইসলামী সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর এবং ইসলাম প্রচারের লীলাভূমি। এ পবিত্র ভূমির প্রতি ভালোবাসা সকল মুসলিমের রয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক ক্বাবাঘর নির্মাণের ৪০ বছর পর, তাঁর পুত্র হযরত ইসহাকের সন্তান হযরত ইয়াকুব (আঃ) ফিলিস্তিনের জেরুজালেম নামক স্থানে 'আল-আক্বসা' মাসজিদটি নির্মাণ করেন। এরপর তাঁর ছেলে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর বংশধর হযরত দাউদ (আঃ) এর সন্তান হযরত সুলাইমান (আঃ) তা পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি রমযানের মাসের শেষ শুক্রবার জেরুজালেম নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

ক্বাবা শারীফ প্রথমে ক্বিবলা থাকলেও আল-আক্বসা নির্মাণের পর এটি ক্বিবলা বলে স্বীকৃতি পায়। প্রিয় নাবী (সঃ) ওহী লাভ ও নাবুআত প্রকাশের সময় 'বাইতুল মুক্বাদ্দাস'ই ক্বিবলা ছিল। পরে তা পরিবর্তন হয়। এই জন্য 'বাইতুল মুক্বাদ্দাস'কে প্রথম ক্বিবলা বলা হয়।

হযরত উমার ফারুক (রাঃ) এর আমলে ৬৪৮ সালে বাইতুল মুক্বাদ্দাস, জেরুজালেমসহ পুরো ফিলিস্তিন সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের অধিকারে আসে। ১০৯৬ সালে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন জবর দখল করে নেয়। ১১৮৭ সালে মুসলিম বীর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রঃ) পুনরায় জেরুজালেম শহর মুসলমানদের অধীনে নিয়ে আসেন। এ বছর থেকে খ্রিষ্টান ও ইহুদীচক্র ফিলিস্তিনে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ১৯১৭ সালে ইংরেজরা ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশ করে এবং ১৯২০ সালে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। মুসলমানরা তা মেনে নিতে পারেনি। ফলে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়। ব্রিটিশরা এই ভূমিকে মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে বেলফোর ঘোষণার দ্বারা অবৈধ ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন থেকে মুসলমানদের প্রতি ইহুদীদের জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়তে থাকে, যা আজও চলমান।

১৯৬৭ সালে অবৈধ ইজরাইল রাষ্ট্র মাসজিদুল আক্বসা জবরদখল করে। মুসলমানরা আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭৯ সাল থেকে 'আল-আক্বসা' মাসজিদ মুক্তির জন্য সমগ্র মুসলিম উম্মাহ প্রতিবছর রমাযান মাসের শেষ দশকের শুক্রবার 'আল-কুদস দিবস' পালন করে। তখন থেকে সারা বিশ্বে দিনটি মুসলিম মুক্তির ও ঐক্যের প্রতীকরূপে পালিত হয়।

আল কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে দৃঢ়রূপে ধারণ করো, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আলে ইমরান-১০৩)। ২০২১ সালের মে মাসে আবার ইজরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ হয়। এতে মুসলিম বিশ্বের সাথে সাথে অন্যান্য দেশগুলোও ফিলিস্তিনকে সমর্থন করে। আমাদের দেশও উভয় দেশকে শান্তির বার্তা পাঠায়, যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার দায়িত্ব পালন করে। যাইহোক, মাসজিদুল আক্বসা ইসলামী ঐক্যের প্রতীকরূপে কাজ করুক বিশ্ব মুসলিমদের হৃদয়ে। আমীন।

কুরবানীঃ আল্লাহ্‌কে সর্বোচ্চ ভালোবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

✍ আবু আব্দুল্লাহ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ - فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ - وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ - قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ - إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ (সূরা আস সফফাতঃ ১০৩-১০৭)

অনুবাদ:

সে যখন পিতার সাথে ছুটাছুটি করার বয়সে পৌছালো, তখন ইবরাহীম তাকে বললো, "হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তুমি বলো তোমার অভিমত কী?" সে বললো, "হে পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা কার্যকর করুন; আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ সবরকারীই পাবেন।" যখন তারা উভয়ে অনুগত হয়ে শির নত করে দিলেন এবং তিনি তার পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, "হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছো।" নিশ্চয় এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরুস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিলো এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

নামকরণ:

সূরার প্রথম আয়াতের والصفات শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এর অর্থ "সারিবদ্ধ"। এটি আল কুরআনের ৩৭ নং সূরা। এতে রুকু আছে ৫টি এবং আয়াত আছে ১৮২ টি।

নাযিলের প্রেক্ষাপট:

বিষয়বস্তু ও বক্তব্য উপস্থাপনা পদ্ধতি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, যখন এ সূরাটি নাযিল হয় তখন রাসূল (সঃ) এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন বাতিল শক্তির প্রবল বাঁধার মুখে রীতিমতো কোণঠাসা অবস্থায় ছিলো। বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এই সূরাটি রাসূলের মাক্কী যুগের মাঝামাঝির কিছু পরেই নাযিল হয়েছে। অন্য সব মাক্কী সূরার মতোই এই সূরাটাও ছোটো ছোটো আয়াত সম্বলিত, অপরূপ ছন্দময়, দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী ও তীব্র আবেগ সৃষ্টিকারী বর্ণনার সমষ্টি। ইবরাহীম (আঃ) এর ঈমানী পরীক্ষা: মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে আল্লাহ বারবারই ঈমানী পরীক্ষার মুখোমুখি করেছেন। সেই অগ্নিপরীক্ষার আগুনে পুড়ে নিজেকে নিখাঁদ প্রমাণ করেই তিনি আল্লাহর প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। আজকের আলোচিত আয়াতগুলোর সাথেও জড়িয়ে আছে এমনি এক ঈমানী পরীক্ষার অবিস্মরণীয় ঘটনা। কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় সার্থকভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার এক সোনালী কাহিনী। নিঃসন্তান ইবরাহিম (আঃ) কে মহান প্রভু বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান করলেন। প্রথমে দিলেন ইসমাঈলকে। ইসমাঈল (আঃ) যখন কিশোর বয়সে উপনীত হলেন ঠিক তখনই আল্লাহ আরো একবার ইবরাহীম (আঃ) কে কঠিন পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবারের অগ্নিপরীক্ষা পিতা-পুত্র দু'জনেরই। এই পরীক্ষায় উভয়ের উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরবময় কাহিনীই আল্লাহ নিজে বর্ণন করেছেন আজকের আলোচিত আয়াতগুলোতে।

ব্যাখ্যা: আয়াত ১০২

এই আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সেই ঐতিহাসিক স্বপ্নের বর্ণনা দেয়া হয়েছে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায়। বৃদ্ধ বয়সে স্নেহ-মমতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি নিজের কিশোর সন্তান ইসমাঈলকে ডেকে তিনি স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে বললেন, "হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি কি বলো?" স্বপ্নের মর্মার্থ বুঝতে কিশোর ইসমাঈলের মোটেও কষ্ট হলো না। কালবিলম্ব না করে তিনি বীরত্বের

সাথে উত্তর দিলেন, "হে পিতা! আপনাকে যা কিছু হুকুম করা হয়েছে, তা কার্যকর করুন। আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ সবরকারীই পাবেন।"

পিতা-পুত্রের এই বীরোচিত সংলাপে বিমুগ্ধ হলো সমগ্র বিশ্বজাহান। আকাশের ফিরিশতারা অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করলো আল্লাহর দুই বান্দার বিস্ময়কর কথপোকথন। কি মনোমুগ্ধকর বিষয়! মহান আল্লাহ তাকে স্বপ্নে দেখালেন, তিনি ইসমাঈলকে যবেহ করছেন, আর তা থেকেই তাঁর প্রিয় বান্দা বুঝে নিলেন আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটির কুরবানি চাচ্ছেন, যা হবে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। পক্ষান্তরে কিশোর বয়সের একজন ছেলে কতটা আল্লাহর আনুগত্যের কাছে শির নতকারী হতে পারেন যে, নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য পিতাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিতে পারেন।

আয়াত ১০৩

পিতা-পুত্র প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আল্লাহ নিজেই পিতা-পুত্র দু'জনেরই আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়ে বলছেন, "অতঃপর উভয়ে আনুগত্যের শির নত করে দিলো।" উভয়ের অন্তর কেঁপে ওঠলো। মৃত্যু ভয়ে নয়। পিতৃ ভালোবাসা আর পুত্রস্নেহে। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) দৃঢ়চিত্তে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রস্তুত। আর তাই প্রিয় পুত্রের মুখটি দেখে কোনো স্নেহ-মমতা যেনো তাকে বিচলিত না করে সেজন্য তিনি ইসমাঈলকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে ছুরি চালালেন সন্তানের গলায়।

আয়াত ১০৪ ও ১০৫

রহমতের ভান্ডার আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কোনো ইচ্ছে ছিলো না ইসমাঈলকে কেড়ে নেয়ার। তাই আল্লাহ যখন দেখলেন বুড়ো বাপ তার বৃদ্ধ বয়সের আকাঙ্খার সন্তানকে নিছক তাঁর সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরবানী করে দিতে ছুরি চালিয়ে দিয়েছেন, এই দৃশ্য তাঁর রহমতের দরিয়ায় ঢেউ তুলে দিলো। তিনি আওয়াজ করে বললেন, "হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছো।" অর্থাৎ তুমি পুত্রকে যবেহ করে দিয়েছো এবং প্রাণ বেড়িয়ে গেছে, এটাতো আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখাইনি। বরং আমি দেখিয়েছি তুমি যবেহ করছো। তুমি সে স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছো। দয়ালু আল্লাহ ইসমাঈল (আঃ) এর পরিবর্তে কুরবানীর জন্য সেখানে একটি দুম্বা পাঠিয়ে দিলেন। কবুল হয়ে গেলো ইবরাহীম (আঃ) এর কুরবানি আর অক্ষত থাকলেন প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)।

আল্লাহ বলেন, "এভাবেই আমি সৎকর্মকারীদের পুরস্কৃত করে থাকি।" আয়াত ১০৬ এই ঘটনাকে আল্লাহ এক স্পষ্ট পরীক্ষা হিসেবে ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ ইসমাঈল (আঃ) কে কুরবানী করা উদ্দেশ্য ছিলো না, উদ্দেশ্য ছিলো অন্য সবকিছুর তুলনায় আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। যুগে যুগেই আল্লাহ ঈমানের দাবীদারদের পরীক্ষা করেছেন। আজও যারা ঈমানের দাবী করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার মুখোমুখি হতেই হবে। আর ঈমানের এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অন্য সবকিছুর তুলনায় আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সঃ) ও দ্বীন কায়েমের আন্দোলনকেই সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে। সূরা তাওবার ২৪ নম্বর আয়াতে অত্যান্ত পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে: "(হে রাসূল) বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা মন্দা হওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো এসব যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও (দ্বীন কায়েমের জন্য) তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হবে প্রত্যেক মু'মিনের জীবনের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ফাঁসির মঞ্চও মু'মিনকে এ লক্ষ্য থেকে সামান্য টলাতে পারবে না। আসন্ন কুরবানির ঈদে পশু কুরবানির

পরবর্তী অংশ ৩১ নং পাতায়

প্রকৃত প্রশান্তি

মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ .

"যায়িদ বিন সাবিত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবে, আল্লাহ তার মনের স্বস্তি ও শান্তি ছিনিয়ে নিবেন। সে সর্বদা অর্থ সংগ্রহের লালসার শিকারে পরিণত হবে। কিন্তু দুনিয়ায় ততোটুকুই সে লাভ করতে পারবে যতোটুকু তার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। আর যাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তাদের স্বস্তি ও শান্তি দান করবেন এবং অর্থ লালসা হতে মনকে হিফাজত রাখবেন। দুনিয়ার যতটুকু তার জন্য নির্দিষ্ট আছে ততোটুকু তো অবশ্যই পাবে।" (তারগীব ও তারহীব, যাদেরাহ, মিশকাত)

রাবীর (বর্ণনাকারী) পরিচয়

যায়িদ নাম। কুনিয়াত আবু সাঈদ, আবু খায়েজাহ এবং আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম সাবিত বিন জাহহাক। মায়ের নাম নাওয়ার বিনতে মালিক। নবী করীম (সাঃ) হিজরতের এক বৎসর পূর্বে হযরত মাসয়াব ইবনে উমাইর (রাঃ) কে মদীনায় প্রশিক্ষক রূপে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াতে আওস ও খাযরাজ গোত্রের যে সকল মহাত্মাগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, হযরত যায়িদ ছিলেন তাদের অন্যতম। মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় সমান পারদর্শী ছিলেন। চতুর্মুখী মেধা ও যোগ্যতার কারণেই নবী করীম (সাঃ) তাকে কাতেবে ওহী বা ওহী লেখকদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি শুধু ওহীই লিখতেন না বরং তিনি ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর ব্যক্তিগত সচিব। বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহদের নিকট হতে যে সকল পত্রাবলী আসতো, তা তিনি অনুবাদ করে নবী করীম (সাঃ) কে শুনাতেন এবং তার পক্ষ থেকে উত্তর দিতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কুরআন সংকলনের জন্য যে কমিটি গঠণ করেন তার নেতৃত্ব দেন হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত। হযরত উমর (রাঃ)এর খিলাফত কালে তিনি লেখক, মাজলিসে শুরা সদস্য এবং মদীনা মুনাওয়ারার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি হিজরী ৪৫/৪৬ সনে ৫৬ বৎসর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৯২টি। বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্যের হাদীস ৫টি।

হাদীসটির গুরুত্ব

পৃথিবীতে মানুষ যতো চেষ্টাই করুক না কেন তার জন্য যতোটুকু রিজিক বরাদ্দ আছে তার চেয়ে একটি দানাও সে বেশী পাবেনা। তাই আখিরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার পিছনে দৌড়ানো কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা আখিরাতের কল্যাণের লক্ষ্যে যদি সে কাজ করে তবে দুনিয়া হতেও সে বঞ্চিত হবে না। সেজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে-প্রতিটি মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আখিরাত। কারণ আখিরাতের সাথে দুনিয়া জড়িত। কিন্তু দুনিয়া যদি কোন ব্যক্তির লক্ষ্য হয় তবে সে নির্ঘাত আখিরাত হারাবে। কেননা দুনিয়ার সাথে আখিরাত জড়িত নয় (অর্থাৎ দুনিয়াকে বাদ দিয়ে আখিরাত অর্জন সম্ভব নয় কেননা নবী করীম (সাঃ) বলেছেন - "পৃথিবী হচ্ছে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র পক্ষান্তরে আখিরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা করা সম্ভব।) বস্তুত একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে তার চিন্তা ভাবনা কি হওয়া উচিৎ তা হাদীসে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

হাদিসটির ব্যাখ্যা

প্রতিটি মানুষের ভাগ্যলিপি (তাকদীর) নির্দিষ্ট। মানুষের ভাগ্যলিপিতে যা আছে তা অবশ্যই ঘটবে। তবে মানুষের ইচ্ছে এবং চেষ্টার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহু শুধুমাত্র ইচ্ছে এবং চেষ্টার স্বাধীনতার বিচারই করবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- পৃথিবীতে যার জন্য যতোটুকু সম্পদ নির্দিষ্ট রয়েছে তার বেশী কোন অবস্থাতেই অর্জন করা যাবে না। কাজেই যে পৃথিবী নশ্বর এবং যেখানে অবস্থান কাল একজন পথচারী বা মুসাফিরের চেয়ে বেশী নয়, সেখানে আরাম আয়েশ বা ধন-ঐশ্বর্যের গুরুত্ব কোথায়? তবু দেখা যাচ্ছে- সে নশ্বর বস্তুর জন্যই প্রতিটি মানুষ জীবনপাত করছে। অথচ আমরা সবাই জানি, যেদিন মৃত্যু আমাদেরকে পৃথিবীর মোহ-মায়া, আরাম-আয়েশ সবকিছু হতে তাড়িয়ে দিবে মহাকালের দিকে, সেদিন সব কিছুই পড়ে থাকবে। ছেলে মেয়ে এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ভোগ করবে সমস্ত সম্পদ।

নবী করীম (সা) বলেনঃ

إِنَّ الدُّنيا حُلوةٌ خَضِرةٌ، وإِنَّ اللهَ مُستخلِفكم فيها فَيَنْظر كيف تَعمَلون

"দুনিয়া সবুজ মনোরম চাকচিক্যময় করে তাতে তোমাদের প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন। যেন তিনি দেখতে পারেন তোমরা কিরূপ আমল করো।" (মুসলিম)

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

"প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ফিতনা (পরীক্ষার বস্তু) আছে। আমার উম্মতের ফিতনা হচ্ছে সম্পদ।" (তিরমিযি)

الكَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَه هَوَاهَا، وتَمَنَّى عَلَى اللهِ

"বুদ্ধিমান- জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে আত্মসমালোচনা করলো এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করলো। আর দুর্বল কাপুরুষ সে ব্যক্তি, যে তার নফসকে খাহেশ ও কামনা-বাসনার অনুসারী করে দিয়েছে। অথচ আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করে বসে আছে।

মহান আল্লাহ রাব্বল আলামীন বলেনঃ

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

"জেনে রাখো। দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে একটি খেলা-মন ভুলানোর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য মাত্র, তোমাদের পরস্পরের গৌরব অহংকার আর ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির দিক দিয়ে একে অপরের চেয়ে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র।" (সূরা আল-হাদীদ)

সব কিছু জেনে বুঝেও যারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায় তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফরমান হচ্ছেঃ "যদি কেউ পরকালীন ফসল চায় তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করে দেই। আর যে লোক দুনিয়ায়ই তার ফসল পেতে চায় তাকে আমরা দুনিয়া হতেই দান করি। কিন্তু পরকালে তার কোন অংশই থাকবে না।" (সূরা আস-শুরা)

দুনিয়া সন্ধানী এবং আখিরাত সন্ধানীর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্যের কথা হাদীসে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে দুনিয়া সন্ধানী কখনো তৃপ্তি বা মানসিক প্রশান্তি পায় না, পক্ষান্তরে আখিরাত সন্ধানী সর্বাবস্থায় তৃপ্তি এবং মানসিক প্রশান্তির সাথে থাকে।

শিক্ষাবলী

(১) দুনিয়া নশ্বর এবং আখিরাত অবিনশ্বর।

(২) দুনিয়ার মোহে আবিষ্ট হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(৩) নির্দিষ্ট রিজিক আল্লাহ অবশ্যই প্রদান করবেন, কিন্তু মানুষের চেষ্টায় তার পরিমাণ বাড়ানো যায়না।

(৪) মানুষ যখন দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে তখন আল্লাহ তার স্বস্তি ও মানসিক প্রশান্তি ছিনিয়ে নেন।

(৫) পক্ষান্তরে যারা পরকালকে অগ্রাধিকার দিবে আল্লাহ্ তাদেরকে মানসিক প্রশান্তি দান করবেন। এবং সেই সাথে নির্দিষ্ট রিজিক ও তারা লাভ করবে।

(৬) পরকালের মুক্তি ও সাফল্য নির্ভর করে দুনিয়ার কর্মতৎপরতার উপর।

নিশ্চিত সফল মুমিনের গুণাবলী

আবদুল্লাহ মিসবাহী

পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশের পর...

১১. মন্দ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকা

তারা মন্দ কাজ সমূহ থেকে দূরে থাকবে। যেমন : (ক) বাজে আড্ডা দিবেনা : "তারা অসার কার্যকলাপ (বাজে আড্ডা) থেকে বিরত থাকে।" (মুমিনুন : ৩)

(খ) অপচয় করবেনা: "যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই।" (বানী ইসরাইল : ২৮)

"যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না।" (ফুরকান : ৬৭)

(গ) মন্দ কথার অনুশীলন করবেনা: "মুমিনগণ মন্দ কথা, কটু কথা, নিরর্থক কথা অশালীন কথা, নিন্দনীয় কথা ইত্যাদি অসুন্দর কথাকে পরিহার করে চলবে। মন্দ কথা প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না।" (নিসা:১৪৮) কোনো মুসলিমকে গালি দিবেনা, "কেননা মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী।" (বুখারী, মুসলিম) "আর তোমরা অনুমান করে কথা বলো না, কারণ অনুমান হচ্ছে জঘন্যতম মিথ্যা কথা।" (বুখারী, মুসলিম)

"আর একটি মন্দ কথা একটি বাজে গাছের মতোই, যাকে ভুমি থেকে উপড়ে ফেলা হয়, যার স্থায়িত্ব নেই।" (সূরা ইব্রাহিম :২৬)

(ঘ) নেতৃত্ব চেয়ে নিবে না : মুমিন কখনই নেতৃত্বের লোভে ইসলামের কাজ লোক দেখানো করবেনা। নেতৃত্ব আল্লাহ যার উপর চায়বেন তাকে দান করে থাকেন।

(ঙ) কোনো গোপন সিদ্ধান্ত ফাস করবেনা : দ্বীনের স্বার্থই বড়, কিছু ক্ষতির আশংকা থাকলেও ইসলামের কোনো গোপন বিষয় ফাঁস করবে না।

(চ) যৌনাঙ্গের অপব্যবহার করবেনা : মুমিনগণ যৌনাঙ্গের অপব্যবহার থেকে বেঁচে থাকবে। "আর যেনা (অবৈধ যৌনাচার) এর নিকটবর্তী হয়োনা এটি-অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।" (সূরা ইসরা:৩২)

"তারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে।" (আল-মুমিনুন:৫)

(ছ) ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করবেনা : "আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবেনা।" (আল ফুরকান:৬৮)

"দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই আর তোমাদেরকেও, তাদের হত্যা মহাপাপ।" (আল ইসরা :৩১)

১২. তাজকিয়া বা পরিশুদ্ধিকরণ

মুমিনগণ নিজেদের তাজকিয়া করবে। এ মর্মে রবের বাণী- "নিশ্চয়ই সফল হয়েছে সে ব্যক্তি যে পরিশুদ্ধ হয়েছে।" (সুরা আলা: ১৪)

"নিসন্দেহে সেই ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে পেরেছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পেরেছে।" (আশ-শামস : ৯)

১৩. সুন্দর কথা বলবে

মুমিনগণ অর্থবহ কল্যাণ মূলক, মিষ্টি বাক্যে সুন্দর কথা বলবে। এ মর্মে মহান রবের বাণী- "আর মানুষের সাথে সদালাপ (সুন্দর কথা) করবে।" (আল বাক্বারা : ৮৩)

"তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল।" (বানী ইসরাইল : ২৮)

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।" (আহযাব : ৭০)

"কেউ যখন তোমাদেরকে সম্ভাষণ (সালাম) জানাবে, প্রতি উত্তরে তার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ জানাবে, অথবা অনুরূপ জানাবে।" (নিসা : ৮৬)

"তাদের নির্দেশ করা হয়েছে পূত-পরিচ্ছন্ন কথা বলার।" (ত্বহা : ২৮) "বস্তুত তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে।" (আহযাব : ৩২) "আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল । তা না হয়ে যদি তুমি তাদের প্রতি কাঠোর হতে তাহলে তোমার কাছ থেকে সরে পড়ত।" (আল ইমরান : ১৫৯) "একটি ভালো কথা একটি ভালো গাছের মতো, মাটিতে যার বদ্ধমূল শিকড়, আকাশে যার বিস্তৃত শাখা সব সময় সে দিয়ে যায় ফুল আর ফল।" (ইব্রাহীম : ২৪-২৫) এ মর্মে নবী (সঃ) এর বাণী- "আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসুল (সঃ) বলেছেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার শপথ করে বলছি, তোমরা ঈমানদার হবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান লাভ করতে পারবেনা যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আর আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবনা যা তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধিলাভ করবে। আর তা হলো তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে।" (তি:মি হা/নং- ২৬৮৮, মুসলিম হা/নং-৫৪) " আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসুল (সঃ) এর কাছে আরজ করল ইসলামের কোন অভ্যাসটি উত্তম? রসুল (সঃ) বললেন অপরকে খাবার খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।" (বুখারী -১২,২৮,৬২৩৬, মুমলিম- ৩৯)

১৪. তাকওয়ার কাজে সহযোগী

যাতে আল্লাহ্ ভীরু বা পরহেযগার তৈরী হতে পারে এমন সকল কাজে মুমিনগণ সহযোগীতায় এগিয়ে যাবে। এ মর্মে মহান রবের বাণী- "সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে তোমরা পরস্পর সহযোগীতা করবে।" (আল মায়িদাহ : ২)

১৫, কথা ও কর্মে মিল থাকবে

মুমিনগণ কথা যেমন বলবে অনুরূপ কর্মে বাস্তবায়ন করবে। এ মর্মে মহান রবের বাণী- "তোমরা সে কথা কেন বল যা তোমরা নিজে করোনা।" (আস সফ : ২)

১৬. ইনসাফ কারী হবে

মুমিনগণ কারো প্রতি বেইনসাফী করবে না। ছোট-বড়, ধনী-গরীব, মুসলিম-অমুলিম সর্বদা সকলের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে। এমর্মে মহান রবের বাণী- "আল্লাহ ন্যায় পরায়নতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।" (সুরা নাহল : ৯০) এ মর্মে নবী (সঃ) এর বাণী- "আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন, সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়াই থাকবেনা। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী হচ্ছে- ইনসাফকারী ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি।" (বুখারী, যাকাত অঃ, পৃষ্টা-১৯) মহান রব বলেন "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর জন্যে ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দাও।" (নিসা : ১৩৫)

১৭. আমানতদার হবে

মুমিনগণ আমানতের রক্ষা কবয হবে। যতই ছোট হোক কিংবা বড় আমানত এর ব্যাপারে কোন প্রকার ঢিলেমী থাকবেনা। মুমিনগণ আমানতের বিপরীত খিয়ানতের বিন্দুমাত্র পরিচয় বহন করবে না। এ মর্মে মহান রবের বাণী- "হে মু'মিনগণ! তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, আর যে বিষয়ে তোমরা আমানাত প্রাপ্ত হয়েছ তাতেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না ।" (আনফাল : ২৭)

এমর্মে নবী (সঃ) এর বাণী "আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুল (সঃ) হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্বসাৎ করেছে তুমি তার আমানত আত্বসাৎ করানো।" (তিঃ মি হা- ২৮২২)

১৮. জ্ঞান আহরোন ও বিতরণ

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিকল্প ভাবায় যায় না। মুমিনগণ প্রতিটি স্তরে সফলতার জন্য জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিবে। এর জন্য ভালো ভালো সাহিত্যকে নির্বাচন করবে। কুরআন ও হাদীসের সেরা তাফসীর গুলি থেকে মূল্যবান জ্ঞান আহরোন

করবে। জ্ঞান মানুষকে বড় হতে সাহায্য করে। এ মর্মে রবের বাণী "পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (আলাক্ব : ১) "নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।" (ফাতির : ২৮) "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানী, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।" (আল মুজাদাহ : ১১) "যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয় এরা উভয় কি এক হতে পারে?"(যুমার : ৯)

নবী (সঃ) বলেন "তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে কুরআন শিখে এবং শিখায়।" (বুখারী) "তারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে।" (আল ফাতির : ২৯) "যেমন (তোমরা আমার একটি অনুগ্রহ লাভ করেছ যে) আমি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতগুলো তোমাদেরকে পড়ে শুনায়, তোমাদেরকে শুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান (সুন্নাত) শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।" (আল বাক্বারা : ১৫১)

১৯. ক্ষমাপরায়ণ হবে

"আর তোমরা যদি ক্ষমা করো, তবে তা হবে পরহেজগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেওনা।" (আল বাক্বারা : ২৩৭) "যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষকে ক্ষমা করে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ মুহসিন লোকদের ভালোবাসেন।" (আল ইমরান : ১৩৪) "তোমরা যদি কল্যাণ করো প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও; তবে জেনে রেখো আল্লাহ নিজেও ক্ষমা কারী, মহাশক্তিমান।" (আন নিসা-১৪৯) "অবশ্য যে সবর ও ক্ষমা করে, নিশ্চয় এটা অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ।" (আশ শুরা : ৪৩) "নবী (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মুসলিম ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা- ১১৪)

২০. যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর স্মরণ

মুমিনগণ প্রকাশ্যে, গোপনে, নির্জনে সদা সর্বদা মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকর করতে থাকবে। মহান রবের বাণী- "আর যিকর করতে থাক আপন মনে মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং অনুচ্চ স্বরে সকাল-সন্ধ্যায় । আর উদাসীনদের দলভুক্ত হয়োনা।" (আল আরাফ : ২০৫)

"নিশ্চয়ই মুমিন হচ্ছে তারা যখন আল্লাহর যিকর (স্মরণ) হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে।" (আনফাল : ৯)

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো এবং সকাল-বিকাল (সার্বক্ষনিক) আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো।" (আহযাব: ৪০-৪১) এ মর্মে নবী (সঃ) এর বাণী- "আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে আর যে স্মরণ করেনা, তাদের দুজনের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত লোকের অনুরূপ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্মরণ করে সে জীবিত ব্যক্তির ন্যায় এবং যে ব্যক্তি স্মরণ করেনা সে মৃত ব্যক্তির ন্যায়।" (বুখারী ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৯) সুতরাং "তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (আল বাকারা : ১৫২)

২১. ইহতেসাব বা আত্মসমীক্ষা

আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামত পেয়ে ধন্য এমন মুমিনরা কখনই সকাল-দুপুর, বিকাল-রাত অতিবাহিত করবে, আর পূর্বের দিন পরের দিন তার উন্নতি হল না, যে তিমিরে ছিল ঐ তিমিরেই আছে না অবনতি ঘটল তা ইহতেসাব বা আত্মসমীক্ষা করবে না এমনটি হতে পারে না। মুমিনরা গঠন মূলক আত্মসমীক্ষা করবে। এ মর্মে মহান রবের বাণী- "মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু এরা গাফিলতির মধ্যে পড়ে রয়েছে।" (আম্বিয়া : ১)

"সেদিন (কিয়ামত) তোমাদেরকে দেয়া প্রত্যেকটি নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (তাকাসুর:৮)

২২. অহংকার পরিহার করবে

সমস্ত সৎগুন সমূহকে সমূলে যে অসৎ গুনটি মূলোৎপাটনের জন্য যথেষ্ট, তা হল অহংকার। মুমিনের জীবনে এমন ধ্বংসাত্মক অসৎগুন কখনই কাম্য নয়। এ মর্মে মহান রবের বাণী- । "আল্লাহ দাম্ভিক আত্ম-গর্বিত ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না।" (নিসা :৩৬)

"লোকমান! তার ছেলেকে উপদেশ দেন- অহংকার বসে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চলো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না।" (লুকমান : ৮)

এ মর্মে নবী (সঃ) এর বাণী- "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমানও অহংকার আছে।" (মুসলিম ১ম খন্ড অঃ ঈমান পৃষ্ঠা-১৫২)

২৩. সবর বা ধৈর্যধারণ

আরবী 'সবর' এর আভিধানিক অর্থ হল - ধৈর্যধারণ করা, বিরত থাকা, বেধে রাখা, দৃঢ় অবিচল থাকা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় সর্বপ্রকার বিপদ আপদে বা কোনো বালা মুসিবতে, কিংবা কোনো অন্যায়-অত্যাচার, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিতে বিচলিত না হয়ে- আল্লাহর উপর নির্ভর করে সবকিছু সহ্য করে অটল-অবিচল থাকাকেই সবর বা ধৈর্য বলে। উক্ত সকল গুনের অধিকারী হবেন মুমিনগণ । এ মর্মে মহান রবের বাণী- "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও স্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (বাক্বারা : ১৫৩) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং বাতিল পন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খিদমত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগো।" (আল ইমরান : ২০০)

এ মর্মে নবী (সঃ) এর বাণী- "আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুললুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ধৈর্যধারনের চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি।" (বুরী ও মুসলিম)

২৪. সময়ের সৎ ব্যবহার

সময় এক অমূল্য সম্পদ। সময়ের অপর নাম জীবন। আল্লাহর দেওয়া অমূল্য নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার মুমিনের জীবনের অন্যতম গুন। হেলায় ফেলায় কোন রকমে যেন মুহুর্ত সময়ও অপ্রয়োজনীয় কাজে নষ্ট না হয়। এ মর্মে মহান রবের বাণী "সময় বা কালের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্থের মধ্যে নিমজ্জমান। তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে সৎ আমল করেছে (সময়কে কাজে লাগিয়ে) হক এর উপদেশ দিতে থেকেছে এবং সবর এর উপদেশ দিতে থেকেছে।" (আল আসর : ১-৩)

এ মর্মে হাসান বসরী (রহঃ) বলেন - (ক) হে আদম সন্তান! তুমি কয়েক দিন মাত্র। যখনই একটি দিন চলে গেল তোমার কিছু বয়স চলে গেল। (খ) যে কোন দিন আদম সন্তানের উপর পার হয়ে গেল, সে বলে হে আদম সন্তান আমি নতুন দিন এবং তোমার আমলের উপর সাক্ষী যখন আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাব। তোমার দিকে ফিরব না। ফলে তুমি যা চাও নেকীর কাজ আগে পাঠাও, তুমি তা তোমার সামনে (অর্থাৎ) তোমার কবরে এবং কিয়ামতের দিন পাবে। (গ) হে আদম সন্তান তোমার দিন হল তোমার মেহমান। সুতরাং তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার কর (অর্থাৎ তাকে ইবাদতে ব্যবহার কর)।"

বীর কবি আহমাদ ইবনে খালফ আন্দোলুসী বলেন- "যখন আমি নিশ্চিত রূপে জানি যে, আমার সমস্ত জীবন এক ঘন্টার মত ফলে তাকে ভালো কাজে ও ইবাদতে নিযুক্ত করব না কেন? উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন "নিশ্চয় রাত ও দিন তোমার মধ্যে কাজ করছে। অতএব তুমিও এদুয়ের মধ্যে কাজ কর ।" বিখ্যাত সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন "আমি যতটা ঐদিনের প্রতি লজ্জিত হই যার সূর্য ডুবে গেল, তাতে আমার বয়স কমে গেল কিন্তু আমার আমল বৃদ্ধি হলনা

☞☞☞পরবর্তী অংশ ৩৫ নং পাতায়

প্রবন্ধ

ফিলিস্তিন ইজরাইল সংঘাতঃ কী, কেন এবং কিভাবে শুরু

✍ আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

ইজরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত বর্তমান সময়ের চলমান দীর্ঘতম সংঘাত। কিন্তু কেন কীভাবে এ সংঘাতের সূচনা তা আমরা অনেকেই জানি না। তবে যে সকল মুসলিম দুর্ভাগ্যের আড়ালে ইহুদী বা খ্রিস্টান চক্রান্ত খুঁজে পেতে চান, হয়ত এ লেখাটা তাদেরকে ঐতিহাসিক অর্থেই ভিন্ন একটা আঙ্গিকে পথ দেখাবে। আর যারা সত্যি সত্যি এ সংঘাতের উৎস জানতে এ লেখাটি পড়ছেন, আশা করি খুব সহজ সরল ভাষায় পুরো সংঘাতের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পেয়ে যাবেন।

কেন এই দ্বৈরথ?;

সংঘাতের পুরনো 'ইতিহাস' জানতে হলে আমাদের নজর দিতে হবে ধর্মগ্রন্থে। কারণ প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে সমর্থিত হোক বা না হোক, ধর্মীয়ভাবে ইজরায়েল (ইহুদী) আর ফিলিস্তিন (বর্তমানে মুসলিম) জাতি নিজেরা কী বিশ্বাস করে তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য নিয়ে, সেটা তাদের এই পবিত্র ভূমি নিয়ে কাড়াকাড়িতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খেয়াল করে দেখেছেন কি, আমি ফিলিস্তিনের পাশে লিখেছি, "বর্তমানে" মুসলিম। কেন বর্তমানে কথাটা ব্যবহার করলাম? কারণ যখন ইজরায়েলের ইহুদী জাতি তুঙ্গে ছিল সেই হাজার হাজার বছর আগে, তখন ফিলিস্তিন জাতি ছিল পৌত্তলিক। সুতরাং ইজরায়েলের চোখে তারা ছিল 'ভিলেইন'।

প্রথমে আমাদের জানা দরকার ইজরায়েলের ধর্মীয় ইতিহাস কী। হিব্রু বাইবেল এবং ইসলামী ধর্মীয় ইতিহাস মোতাবেক, নবী হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ঈশ্বর ইয়াহওয়েহ (হিব্রুতে ঈশ্বরকে এ নামেই ডাকা হয়, আর আরবিতে আল্লাহ্) তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে পবিত্র ভূমি কেনান তার সন্তানাদিকে দেয়া হবে (যেটা এখন ইজরায়েল ফিলিস্তিন অঞ্চল)। অর্থাৎ তার বংশধররা এ এলাকার মালিক হবে।

ধর্মীয় ইতিহাস:

ইব্রাহিম (আঃ) এর প্রধান দুই পুত্র ইসমাইল (আঃ) আর ইসহাক (আঃ)। ভাগ্যক্রমে, ইসমাইল (আঃ) আর তার মা হাজেরা-কে আরবের মক্কায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। আর ওদিকে কেনান দেশে রয়ে যান ইসহাক (আঃ) [আইজ্যাক]। তার পুত্র ছিলেন ইয়াকুব (আঃ) [জ্যাকব]। ইয়াকুব (আঃ) এর আরেক নাম ছিল ইসরাইল, হিব্রুতে যার আক্ষরিক অর্থ "ঈশ্বরের সাথে জয়ী"। তার বারো সন্তানের নামে ইজরায়েলের বারো গোত্রের নাম হয়।

ঘটনাক্রমে ১২ পুত্রের একজন ইউসুফ (আঃ) ভাইদের চক্রান্তে মিসরে উপনীত হয় দাস হিসেবে। জেলের ভাত খেয়ে সাত বছর পর ভাগ্যের চাকা ঘুরে নিজেকে মিসরকর্তার ডানহাত হিসেবে আবিষ্কার করেন এবং একই সাথে তিনি হন নবী। দুর্ভিক্ষপীড়িত অন্য ভাইরা তারই কাছে তখন সাহায্য চাইতে মিসরে আসে। কালের পরিক্রমায় শত শত বছর বাদে এই ইজরায়লিরা মিসরের ফারাও এর দাসে পরিণত হয়, যখন এক মিসরীয় যুবরাজ (পালিত পুত্র) নিজেকে রাজপরিবারের সমস্ত আয়েশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বহু বছর বাদে ইজরায়েলের নির্যাতিতদের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন, তিনি আর কেউ নন, নবী হযরত মুসা (আঃ)। লোহিত সাগর পার করে তিনি ইজরায়েল জাতিকে নিয়ে যান ওপারে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করে। [বাংলাতে এখানে একটি ভুল তথ্য অনেকে জেনে থাকে যে, মুসা (আঃ) নাকি নীলনদ পার করেছিলেন, কিন্তু কুরআন আর বাইবেল এ ব্যাপারে একমত যে,

এটা লোহিত সাগর ছিল।

নবী মুসা (আঃ) পেলেন আসমানী কিতাব তাওরাত, কিন্তু তখন একেশ্বরবাদী ইহুদীরা পৌত্তলিকতায় মগ্ন হয়ে পড়ায়, ৪০ বছর শাস্তি দেন আল্লাহ্ তাদেরকে। মরুর বুকে ঘুরপাক খেতে থাকে তারা। অবশেষে তারা কেনান দেশে উপনীত হয়। এবার তাদের কেনান জয়ের পালা।

এখানে এসেই আমরা বুঝতে পারি, কেনান দেশের আদি নাগরিক কারা ছিল। তারা আর কেউ নয়, এখন আমরা যাদের ফিলিস্তিনি বলি, বলা চলে তারাই। তবে ফিলিস্তিনিরাও এখানে আসে ইজরায়েলিরা আসার কিছু আগে, খ্রিস্টপূর্ব ১২ শতকে। ফিলিস্তিনিরা মূলত Aegean অরিজিনের। তারা এসেছিল কাফতর থেকে। তার আগে এখানে ছিল হিভাইট, জেবুসাইট, এমরাইট, হিট্টাইট, পেরিসাইট- এরা। তারা পৌত্তলিক ছিল এবং বা'ল, আশের ইত্যাদি দেবতার পূজা করত।

ইজরায়েলিরা যখন কেনান দেশে থাকত, তখন তারা স্থানীয়দের সাথে বিবাহ করে। ফলে পরবর্তী বংশধর এমনভাবে বাড়তে থাকে যে, ৮৭.৫%-ই হলো কেনানীয় রক্ত। আর ফিলিস্তিনিরা নিজেদের কেনানীদের বংশধর বলেই জানে। তাই জিনগতভাবে তারা আসলে প্রায় একই। কেবল ধর্মবিশ্বাসে ছিল আলাদা। ইজরায়েলিরা যেখানে উপাসনা করত এক ঈশ্বরের, সেখানে ফিলিস্তিনিরা ছিল পৌত্তলিক।

ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রথম রাজা হন তালুত, যাকে বাইবেলে বলে সল (Saul)। বেথেলহেমের জেসির ছোট ছেলে দাউদ [ডেভিড] তালুতের সেনাবাহিনী থেকে ফিলিস্তিনের জালুত/গোলায়াথ-কে পরাজিত করে একক যুদ্ধে এবং তখনই সকলের নজরে আসে। কালক্রমে তিনি ইজরায়েলের জনপ্রিয় রাজা কিং ডেভিড/দাউদ হন [এবং ইসলাম মতে, নবীও]। তার পুত্র সলোমন বা সুলাইমান (আঃ) তার রাজ্যকে আরো প্রসারিত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন টেম্পল অফ সলোমন বা বাইতুল মুকাদ্দাস।

ডেভিড আর গোলায়াথের লড়াই- এক ছবিতেই যেন ইজরায়েল আর ফিলিস্তিন;

সুলাইমান বা সলোমনের মারা যাবার পর পুত্র রেহোবামের রাজত্বকালে ইজরায়েলের পতন শুরু হয়, পৌত্তলিকতায় ডুবে যেতে থাকে। শক্তিমান ব্যাবিলন রাজ্যের আক্রমণে ইজরায়েলিরা বন্দি হয়ে পড়ে। তাদের নির্বাসন শুরু হয়, আর ওদিকে ইজরায়েল রাষ্ট্র ধুলায় মিশে যায়।

কিন্তু আল্লাহর চোখে শাস্তি শেষ হলে, পারস্যের রাজা সাইরাস তাদের ব্যাবিলন থেকে মুক্ত করেন। এ সময় নবী হযরত দানিয়েল (আঃ) এর কীর্তি উল্লেখযোগ্য। ফিরে এসে তারা পুনরায় বানায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বাইতুল মুকাদ্দাস। আর নবী/পাকব্যক্তি হজরত উজাইর (আঃ) [এজ্রা] আর নেহেমিয়া (আঃ) এর নেতৃত্বে ইজরায়েল আবার ভালোর দিকে ফিরতে থাকে। তাছাড়া সাহায্য করেন হজরত হিজকিল (আঃ) [এজেকিয়েল]।

বাইবেলের সেই রাজা সাইরাস;

সুলাইমানপুত্র রেহোবামের সময় রাজ্য দুভাগ হবার কথা বলেছিলাম। উত্তরের রাষ্ট্র ইজরায়েল, আর দক্ষিণের রাষ্ট্র জুদাহ। এটা মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ৯ম-১০ম শতকের কথা। আর মাঝখানে এত কাহিনী গিয়ে রাজা সাইরাসের হাতে উদ্ধার পাবার সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সাল।

যখন খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ সালে অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেট মারা গেলেন, তখন তার জেনারেলরা কামড়াকামড়ি শুরু করে দেন রীতিমত। যেমন টলেমি নিয়ে নিলেন পুরো ইহুদী অঞ্চলের দখল। যদিও পরে সিরিয়ার সেলুচিদদের হাতে খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮ সালে হারিয়ে ফেলেন এ অঞ্চল। ওদিকে গ্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইহুদী ধর্ম প্রভাবিত হয়ে নতুন এক সেক্ট গড়ে ওঠে, যারা পরিচিত হয়

হেলেনিস্টিক জ্যু (ইহুদী) নামে। তাদের মাঝে ছিল গ্রিক সংস্কৃতির ছোঁয়া। মূল ধারার ইহুদীরা তাদের ধর্মচ্যুত মনে করত।

খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমান জেনারেল পম্পেই জেরুজালেম দখন করে নেন। যীশুর জন্মের ৪৭ বছর আগে আলেক্সান্দ্রিয়ার যুদ্ধে ৩০০০ ইহুদী সেনা পাঠানো হয় যারা জুলিয়াস সিজার আর ক্লিওপেট্রাকে রক্ষা করে।

রোমান সংসদ হেরোদ নামের একজনকে ইহুদীদের রাজা হিসেবে নিয়োগ দেয়। এরকম সময়ে এই ইহুদী অঞ্চল যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে, তখন জন্মগ্রহণ করেন ঈসা (আঃ)। তিনি ছিলেন "মসীহ" (অভিষিক্ত ত্রাতা) যিনি কিনা এই হতভাগ্য ইহুদী রাষ্ট্রকে উদ্ধার করবেন, নতুন আলোর পথ দেখাবেন। কিন্তু যখন যীশু ইহুদী ইমামদের (র্‌যাবাইদের) দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে লাগলেন তখন ইহুদিরা চক্রান্ত করল যেন রোমান শাসককে বুঝিয়ে সুজিয়ে যীশুকে ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেলা যায়, এবং তাই তারা করে। ইহুদী মতে তারা যীশুকে ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেলে। যদিও ইসলাম মতে, আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আঃ)-কে অক্ষত রাখেন এবং তুলে নেন, যিনি শেষ সময়ে আবার ফেরত আসবেন।

রাজনৈতিক ইতিহাস:

৬৪ সালে ইহুদী রুল জারি করা হয় যে, সকল ইহুদিকে ৬ বছর বয়স থেকেই লেখাপড়া শিখতে হবে। তখন থেকেই ইহুদীরা লেখাপড়াকে খুবই গুরুত্ব সহকারে নিত।

৬৬ সালে রোমান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন রাষ্ট্র ইজরায়েল ঘোষণা করে বসে ইহুদীরা। তখন তাদের শায়েস্তা করা হয়, প্রায় ১ মিলিয়ন ইহুদী মারা যায়।

১৩১ সালে সম্রাট হাদ্রিয়ান ইহুদী ধর্ম নিষিদ্ধ করেন। জেরুজালেমের নাম পরিবর্তন করে রাখেন ইলিয়া কাপিতোলিনা। বাইতুল মুকাদ্দাসের জায়গায় জুপিটার মন্দির বসান। আর ইহুদী প্রদেশের নাম চেঞ্জ করে রাখেন "প্যালেস্টাইন" বা আরবিতে "ফিলিস্তিন"। তখন আবারো বিদ্রোহ করে ইহুদীরা, কিন্তু লাভ হয়নি।

৪র্থ শতকে সম্রাট কন্সটান্টিনোপল জাতীয় ধর্ম হিসেবে খ্রিস্ট ধর্ম ঘোষণা করার পর মরণাঘাত পায় ইহুদী ধর্ম। মোটামুটি বড় নিষেধাজ্ঞা নেমে আসে ইহুদীদের উপর।

৬১১ সালের দিকে পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে পড়ে ইহুদীরা। ওদিকে বাইজান্টিন সম্রাট হেরাক্লিয়াস/হারকিউলিস কথা দেন তিনি ইহুদী অধিকার ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু দেননি।

ইসলামী বিশ্বাস মতে, ৬১১ সালের এক রাতে মুহাম্মাদ (স) মিরাজে জেরুজালেম গিয়েছিলেন, এবং সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাসের ওখানে নামাজ পড়েন। ৬৩৪-৩৬ সালে মুসলিম বাহিনী জেরুজালেম অধিকার করে নেয়। ক্রুসেডের আগ পর্যন্ত খুলাফায়ে রাশেদিন এর শাসন করেন মদিনা থেকে। ৬৯১ সালে আব্দুল মালিক আজকের সেই সোনালি গম্বুজ নির্মাণ করেন। আর ৭০৫ সালে বানানো হয় মসজিদুল আকসা।

ডোম অফ দ্য রক বা বাইতুল মুকাদ্দাস;

১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডে খ্রিস্টানরা জেরুজালেম দখন করে নেয়। কিন্তু ১১৮৭ সালে সুলতান সালাহুদ্দিন (সালাদিন) আইয়ুবি আবার দখন করে নেন জেরুজালেম। এ সময় পর্যন্তও ইহুদীরা ওখানেই থাকত। কিন্তু ধীরে ধীরে ইউরোপে জায়গা করে নিতে থাকে তারা।

ইউরোপের ব্ল্যাক ডেথ মহামারির সময় ইহুদীদের অনেককেই খুন করা হয়, সন্দেহ ছিল- তারা বুঝি কুয়ার পানিতে বিষ মেশাচ্ছে। আর স্পেনে খ্রিস্টান রাজত্বে মুসলিম আর ইহুদী দু'ধর্মের মানুষকেই মারা শুরু হয়ে যায়, যেটার নাম কুখ্যাত স্প্যানিশ ইনকুইজিশন। ততদিনে ১৪৯৭ সাল চলে এলো। ইহুদীরা পালিয়ে রোম, পোল্যান্ড, কিংবা উসমানী সাম্রাজ্যে চলে গেলো।

১৫৩৮ সালে সুলতান সুলেমান জেরুজালেম ঘিরে বিখ্যাত দেয়াল তুলে দেন। যেটা এখন ওয়াল অফ জেরুজালেম নামে পরিচিত।

এরপর কালের বিবর্তনে ১৯ শতকে ইহুদীরা ইউরোপে অধিকার পেতে শুরু করল। তখন অর্ধেক ইহুদিই থাকতো রুশ রাজ্যে। এই রাশিয়ান ইহুদীরা ১৮৮২ সালে হোভেভেই জিওন ("জিওনের জন্য ভালোবাসা") নামের আন্দোলন শুরু করে। জিওন বা জায়ন হলো জেরুজালেমের এক পাহাড়। মূলত জেরুজালেম ফিরে পাবার জন্য এক আন্দোলনের সূচনা সেটা, জায়োনিস্ট আন্দোলন। তারা মৃত হিব্রু ভাষা জীবিত করতে শুরু করল।

১৯০২ সালের মাঝে ৩৫,০০০ ইহুদী এখন চলে আসে ফিলিস্তিনে, যেটা এখন ইজরায়েল নামে পরিচিত। তখন সেটা অবশ্য মুসলিম অধিকারে। এটাকে বলা হয় প্রথম আলিয়া, আলিয়া হলো ইহুদী পুনর্বাসন, যখন অনেক ইহুদী একসাথে সরে আসে। তখন মুসলিম প্রধান ফিলিস্তিনে দেখা গেল, জেরুজালেমের সিংহভাগই হঠাৎ করে ফিরে আসা ইহুদী।

১৮৯৬ সালে Theodor Herzl দ্য জুইশ স্টেট নামে এক লিখনি প্রকাশ করেন যাতে তিনি বলেন, ক্রমবর্ধমান ইউরোপীয় ইহুদীবিদ্বেষের একমাত্র সমাধান আলাদা এক ইহুদী রাষ্ট্র। ১৮৯৭ সালে জায়োনিস্ট সংঘ গড়ে তোলা হয়। প্রথম জায়োনিস্ট কংগ্রেসে লক্ষ্য ধার্য করা হয়, প্যালেস্টাইনে ইহদি রাষ্ট্র করে তুলতে হবে।

১৯১৪ সালের মাঝে দ্বিতীয় আলিয়া হয়ে গেল, ৪০,০০০ ইহুদী এ এলাকায় চলে এলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইহুদীরা সমর্থন দেয় জার্মানিকে, কারণ তারা শত্রু রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছিল। খুবই আইরনিক, না? কারণ পরের বিশ্বযুদ্ধেই এই জার্মানি ইহুদীদের একদম নিশ্চিহ্ন করতে নেমে পড়েছিল!

জায়োনিজম আন্দোলনকারীরা চাচ্ছিল আমেরিকা আর ব্রিটেনের সমর্থন পেতে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ইতোমধ্যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর ইহুদী কমিউনিটির নেতা রথসচাইল্ডকে চিঠি দেন, যা বেলফোর ডিক্লারেশন নামে পরিচিত। এতে বলা হয়, ব্রিটিশ সরকারের এই ইহুদী রাষ্ট্রের ব্যাপারে সমর্থন আছে। ব্রিটিশ আর ফ্রেঞ্চ ব্যুরোক্রেটরা মিলে মধ্যপ্রাচ্যের নতুন সীমা নির্ধারণ করে। বিনিময়ে জায়োনিস্ট স্পাই নেটওয়ার্ক ব্রিটিশ সরকারকে ওসমানি সৈন্য সামন্ত নিয়ে তথ্য পাচার করত।

বেলফোর ঘোষণার পরোক্ষ সমর্থন ১৯২২ সালে লীগ অফ ন্যাশন্স দিয়ে দেয়। ১৯২৩ সালের মাঝে ৩য় আলিয়া হয়, এবং আরো ৪০,০০০ ইহুদী আসে ফিলিস্তিনে। আর ১৯২৯ সালের মাঝে ৪র্থ আলিয়া হয়, যখন আরও ৮২,০০০ ইহুদী চলে আসে। খরচপাতিতে সাহায্য করত জ্যুইশ ন্যাশনাল ফান্ড, বিদেশি জায়োনিস্টরা এতে সাহায্য করত।

১৯২৮ সালে JNC (Jewish National Council) গঠিত হয় ফিলিস্তিনে। ১৯২৯ সালে প্রথম বড় ইহুদী-মুসলিম দাঙ্গা হলো জেরুজালেমের ওয়েইলিং ওয়াল (বুরাক দেয়াল) নিয়ে। ফলে ১৯৩১ সালে জায়োনিস্টরা ইর্গুন জাই লিউমি নামে এক মিলিশিয়া প্রতিষ্ঠা করে। এই ইহুদী সন্ত্রাসী সংগঠন ১৯৪৬ সালে জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে বোমা বিস্ফোরণ করে এবং ১৯৪৮ সালে ইহুদী অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দেইর ইয়াসিন গ্রামে গণহত্যা করে।

১৯৩৩ সালে নাৎসিদের সাথে চুক্তিতে আরো ৫০ হাজার ইহুদী ফিলিস্তিনে চলে আসে। ১৯৩৮ সালের মাঝে ৫ম আলিয়া হয়ে গেল, প্রায় আড়াই লাখ ইহুদী এলো ফিলিস্তিনে।

এরপর শুরু হয়ে গেল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, প্রায় ছয় মিলিয়ন ইহুদী হত্যা করে নাৎসিরা। মোটামুটি এই যুদ্ধের শেষ হবার মধ্য

দিয়ে আমেরিকার ইহুদীরা জায়োনিস্ট মুভমেন্টের মাথা হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৪৬ সালের জুলাইতে সন্ত্রাসী দল ইর্গুন কিং ডেভিড হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেখানে ফিলিস্তিনের British administrative head-quarters ছিল। সে হামলায় মারা যায় ৯১ জন মানুষ, আর আহত হয় ৪৬ জন। ইর্গুন সন্ত্রাসীরা আরবদেশী ওয়ার্কার আর ওয়েইটার সেজে বোম পেতে আসে। বিস্ফোরণে পুরো দক্ষিণ পাশ ভেঙে পড়ে। তখন তেল-আবিব (যেটা বর্তমানে ইজরায়েলের রাজধানী) শহরে কারফিউ জারি করা হয়। ফিলিস্তিনের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ইহুদিকে জেরা করা হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের লেবার সরকার এই ঝামেলাটা সদ্য গঠিত জাতিসংঘকে হ্যান্ডেল করবার জন্য প্রস্তুত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ মে গঠিত হয় United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) যা পরে প্রস্তাব দেয় "স্বাধীন এক আরব রাষ্ট্র, স্বাধীন এক ইহুদী রাষ্ট্র এবং জেরুজালেম শহর"- এই তিন ভাগ। সামান্য কিছু এদিকওদিকের মাধ্যমে জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে এই প্রস্তাব বিষয়ে ভোট হয়। ফলাফল স্বরূপ, ইহুদী সমাজে উচ্ছ্বাস আর আরব সমাজে অসন্তুষ্টি ছড়িয়ে পড়ে।

ঐ অঞ্চলে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। প্রায় ১ লাখ আরব ইহুদীপ্রধান এলাকা ছেড়ে চলে যায়। আমেরিকা তখন ফিলিস্তিন ভাগ করার প্রস্তাব থেকে সমর্থন গুটিয়ে নেয়, কিন্তু ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে ব্রিটেন নতুনতর সাপোর্ট দেয়।

জায়নিস্ট নেতা ডেভিড বেনগুরিওন বাধ্যতামূলক করলেন সকল ইহুদী নারীপুরুষকে মিলিটারি ট্রেনিং নিতে হবে। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে, শেষ ব্রিটিশ সামন্ত এই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। সেদিন তেলআবিব মিউজিয়ামে জ্যুইশ পিপলস কাউন্সিল জড়ো হয় এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। সাথে সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং সোভিয়েতের স্টালিন স্বীকৃতি দেয় ইজরায়েলকে। তবে আরব লিগের মিসর, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক প্রত্যাখ্যান করে।

আরব রাষ্ট্রগুলো তখন ফিলিস্তিনের দিকে এগিয়ে যায় এবং শুরু হয় প্রথম আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ। আরব রাষ্ট্রগুলো অ্যাটাক করে, কিন্তু সদ্যজাত ইজরায়েলের তখনও কোনো ভারি অস্ত্র ছিল না। তখন জাতিসংঘ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করে এ অঞ্চলে ইজরায়েলকে রক্ষা করতে। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়া সেই ব্যান ভঙ্গ করে ইজরায়েলকে অস্ত্র সাপ্লাই দেয়। ১১ জুন এক মাসের শান্তিচুক্তিতে বাধ্য করে জাতিসংঘ।

তবে মারা যায় ইসরায়েলের ৬,০০০ মানুষ। যেখানে মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ছ লাখ। ৭ লাখ ২৬ হাজার ফিলিস্তিনি দেশছাড়া হয়। ১৯৪৭ এর ১১ মে জাতিসংঘে সদস্যপদ পেয়ে যায় ইজরায়েল।

ইজরায়েলের সংসদ "নেসেত" [Knes-set] প্রথম মিলিত হয় তেলআবিবে, এরপর ১৯৪৯ সালের সিজফায়ারের পর চলে যায় জেরুজালেমে। জানুয়ারিতে প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে ইজরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন ডেভিড বেনগুরিওন। ১৯৫১ সালের মাঝেই ইমিগ্রেশনের কারণে ইজরায়েলের জনসংখ্যা হয়ে গেল দ্বিগুণ। ১৯৫৮ সালে সংখ্যাটা দাঁড়ায় বিশ লাখে।

১৯৫৬ সালে সুয়েজ খালজনিত জটিলতায় ইজরায়েল মিসর আক্রমণ করে বসে। ইজরায়েলের মিত্র ছিল ব্রিটেন আর ফ্রান্স। এতে প্রবল নিন্দার ঝড় ওঠে।

এ সময়টাতে ইজরায়েল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী হত্যাকারী নাৎসিদের খুঁজে বের করে হত্যা করতে থাকে, বা মৃত্যুদণ্ড দিতে থাকে। দুর্ধর্ষ ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের তৎপরতা ওঠে তুঙ্গে।

ক্রমশ...

প্রবন্ধ

কুরবানী তোমারে করেছি কুরবানী

✍ মহাঃ হাবিবুল্লাহ

আমার এলাকায় কুরবানীর মাংস বন্টন পদ্ধতিটা এখনো সেকেলে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কুরবানীর মাংস বাড়ি বাড়ি বন্টন করে আসে। আর ছোট থেকেই এই দায়িত্বটা পড়ে আমার ঘাড়ে। কারণ কুরবানীর পশু জবেহ করে মাংস করার কাজে আমার দক্ষতা দেখে, দাদারা বলত, তোকে কিছু করতে হবে না, তুই গিয়ে ঘুমা। পরে মাংস হয়ে গেলে দাদারা বলত, এবার তোমার পালা। কে কে কুরবানী করতে পারে নি, খুঁজে খুঁজে মাংস দিয়ে এসো। এটা আমার কাছে আরো বিরক্তিকর ছিল, কিন্তু কোনো উপায় ছিল না, যেতেই হতো। সে আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগের কথা। এখন আর 'ঐ পাড়াতে' গিয়ে একটি রেডিওর পাশে জটলা পাকিয়ে 'বিবিসি' শোনার দিন নেই। পাশের গ্রামের 'নিশি ডাক্তার' হিরো পুচ নিয়ে গ্রামে ঢুকলে, পাড়ার সমস্ত ছেলেদের দৌড়ে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে ধুলোয় 'চাকার লিক' দেখার দিন কবেই ফুরিয়ে গেছে। প্রত্যেকের হাতেই এখন দুটো তিনটে স্মার্ট ফোন। ঐ ধোঁয়া শোঁকা ছেলেগুলো এখন চা খেতে যায় অ্যাপাচে, এনফিলড, অ্যাভেঞ্জারে চেপে। ফলে এখন কোন বাড়িতে কুরবানী হয়নি, খুঁজতে যাওয়াটা আটলান্টিকে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে যাওয়ার মতোই। আল্লাহর লাখো শুকরিয়া, আজ সবার ঘরে ঘরেই কুরবানী। সবার মধ্যে প্রতিযোগিতা, কার কুরবানী বেশি ভালো, কার ছাগল সব থেকে দামি। তবে আমার আনন্দটা আরো বেশী, কারণ আমার কাজটাও অনেক কমে গেছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবতে ভাবতেই মেসেজ টোন শুনে মোবাইল হাতে নিয়ে দেখি, গ্রুপে কেউ একজন মেসেজ করেছে-

তাদের মাংসও আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, তাদের রক্তও না। কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে যায় তোমাদের তাক্বওয়া। -আল কুরআন।

ভাবনার ঘোরটা যেন কেটে গেল! আমাদের কুরবানীর মাংস রক্ত কিছুই তাঁর কাছে পৌঁছায়না! পৌঁছায় শুধু তাক্বওয়া? কি সেই তাক্বওয়া? আমাদের রয়েছে কি সেই তাক্বওয়া? ভাবতে ভাবতেই গাটা ছমছম করে উঠলো, শিরদাঁড়া দিয়ে যেন শীতল রক্ত স্রোত বয়ে গেল। কারণ এই তাক্বওয়া হচ্ছে এমন এক গুণ, এমন এক বৈশিষ্ট্য যা সাধারণ মুমিন থেকে অনেক অনেক উন্নত। মুমিনদেরকেই তো আল্লাহ্ বলেন, তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করো বা মুত্তাকি হও। এই তাক্বওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই তো আল্লাহ্ পাক আমাদের জন্য সিয়াম ফরজ করেছেন! কিন্তু..., আমরা কি সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছি? আমরা কি রমযান মাসে সেই তাক্বওয়া অর্জন করেছি? না! আমরা শুধু মাত্র একবার নিজেদের দিকে দেখলেই বুঝতে পারব, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমরা করিনি। কারণ এই তাক্বওয়া সম্পর্কে, শহীদে মেহরাব, হজরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করছেন, তাক্বওয়া হচ্ছে এমন একটি গুণ, যেমন করে কেউ কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে গমন করলে, সে সর্বদা চেষ্টা করে ঐ কণ্টক থেকে রক্ষা পাওয়ার। তেমনি কোনো ব্যক্তি যখন সমস্ত প্রকার ছোট বড়ো পাপ থেকে সর্বদাই বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে, তখন তার ঐ গুণকে বলা হয় তাক্বওয়া বা ঐ ব্যক্তিকে বলে মুত্তাকি। এই তাক্বওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ পাক কুরআনে বলছেন "হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর

সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, ...যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পারো (বা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারো)।" আর এই সিয়াম পালনের ঠিক দুই মাস পরেই কুরবানী সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলছেন, তোমাদের কুরবানীর মাংস রক্ত কিছুই তাঁর কাছে পৌঁছায় না, পৌঁছায় শুধু তাক্বওয়া! যেই কুরবানীর সুন্নাতের স্রোতধারা আজও প্রবাহিত, কি ছিল সেই কুরবানী? সেই কুরবানী ছিল ইব্রাহিম (আঃ) এর আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ। সেই কুরবানী ছিল ইব্রাহিম(আঃ) এর আল্লাহর সমস্ত নির্দেশ পালনের কুরবানী, তা পালন করতে গিয়ে প্রিয় সন্তানকেও কুরবানী করতে হোক না কেন। একটিবার আমরা ভাবি তো, আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোন বিষয়ে আমরা তাক্বওয়ার পরিচয় দিই? কোন বিষয়ে আমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করি? আমরা কি সত্যিই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি? যারা নামাজ রোযার ধারে কাছেও নেই তাদের কথা ছেড়েই দিন, আমরা যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, নিজেদের মুমিন, মুসল্লি, আলেম বলে দাবি করি, তারা আল্লাহর ক'টা নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করি? নিজে নামাজ পড়লেও সন্তানকে কবার নামাজের তাগিদ দিই? আমার উপার্জন কতটা বৈধ উপায়ে হয়, কখনো ভেবে দেখি? কর্মস্থলে গিয়ে 'ডিউটি' ফাঁকি দিতে পারলে নিজেকে বিশাল বুদ্ধিমান ভাবি। মিথ্যে বলা, অপরের দোষারোপ করা, কুৎসা রটানো, গিবত করাকে আজ আমরা আমলে পরিনত করে ফেলিনি? আজ ভায়ে ভায়ে সম্পর্ক, পিতা পুত্রের সম্পর্ক, ভাই বোনের সম্পর্ক, আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক সামান্য স্বার্থের জন্য ছিন্ন করে ফেলি। ইয়াতিমের মাল, দরিদ্রের মাল, বায়তুল মাল ভক্ষণ আজ আমাদের কাছে অন্যায় বলে মনে হয়না। সরকারি সম্পত্তি লুট, জনগণের সম্পত্তি লুট করে যারা গাড়ি বাড়ি করে, তারা আমাদের চোখে সম্মানীয় নেতা, সমাজের বিচারক। সমাজের যারা সবচেয়ে বড়ো ক্রিমিনাল, খুনি, ধর্ষক, তারা আমাদের ইসলামিক মহফিলের সম্মানীয় অতিথি। সামান্য ব্যাক্তিগত স্বার্থের বিনিময়ে জালিম শাসকের তোষামোদ, গোলামি করা আজ হিকমত হয়ে দাঁড়িয়েছে! মজলুম অসহায়দের আহাজারি তো আমাদের কানেও পৌঁছায় না!

তাহলে কোথায় আমাদের তাক্বওয়া? কোথায় বা পালন করি আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহর বিধান? এই কুরবানীই বা তাহলে কিসের? কুরবানীর আসল উদ্দেশ্য, কুরবানীর শিক্ষাকেই কি আমরা 'কুরবানী' করে দিইনি? কুরবানীর উদ্দেশ্য কি আমাদের কাছে এখন শুধু দামি পশু কেনার প্রতিযোগিতা নয়? কুরবানীর উদ্দেশ্য কি শুধু পরিবার পরিজন নিয়ে মাংস খাওয়ার উৎসব হয়ে দাঁড়াই নি?

আসুন, কুরবানীর আগে অন্ততপক্ষে একবার নিজেকে নিয়ে ভাবি। আল্লাহর কাছে তৌবা করি, তাক্বওয়ার সঠিক অর্থ বুঝে তাক্বওয়া অর্জনের চেষ্টা করি। পশু কুরবানীর আগে মনের পশুত্বকে কুরবানী করি, প্রবৃত্তির দাসত্বকে কুরবানী করি। আল্লাহর দাসত্ব করি, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি। আল্লাহর বিধানকে ব্যাক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি। তবেই আমাদের কুরবানী কবুল হবে। হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের, তোমার সরল পথে চলার তৌফিক দান কর। হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের কুরবানীর রিয়া থেকে মুক্ত করে তাক্বওয়ার সহিত কুরবানী করার তৌফিক দাও। হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের পশু কেনার প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের কুরবানীগুলো কবুল করো। হে আল্লাহ্, আমার নামাজ আমার কুরবানী, আমার জীবন আমার মরণ একমাত্র তো তোমারই জন্য।

পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও
কৌতুক ব্যতীত কিছুই না।
পরকালের আবাস
পরহেজগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর।
সূরা আল আনআমঃ ৩২

প্রবন্ধ

ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব কি শুধু আলেমদের?

✍ মুহাঃ হাসিমুদ্দিন

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন সমগ্র মানবজাতিকে 'সৃষ্টির সেরা' করে সৃষ্টি করেছেন। শুধু সৃষ্টির সেরা করে ছেড়ে দেন নি, এ জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। সাথে সাথে জীবন বিধান তথা আসমানি কিতাব দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ সঠিক সত্য পথে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর মানুষ যাতে শয়তানের পথে না চলে, একমাত্র আল্লাহ্ নির্দেশিত পথে চলে, এজন্য অসংখ্য নাবী-রাসুল, মহান মনিষীদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী তাঁরা যথাসাধ্যভাবে মানুষকে হিদায়েতের পথ তথা ইসলামের পথে পরিচালিত করেন, কেননা সারা পৃথিবীতে যত মতাদর্শ রয়েছে, তার মধ্যে ইসলামই আল্লাহর নিকট মনোনীত ও গ্রহণীয় মতবাদ। বাকী যত মতবাদ ছড়িয়ে আছে তা বাতিল, ইসলাম পরিপন্থী এবং আল্লাহর অপছন্দনীয়। তাই তো যুগে-যুগে, কালে-কালে নবি-রাসুলগণ, মহান মনীষীগণ দ্বীনের প্রচারে মূল্যবান সময়, বুদ্ধি, অর্থ, এমনকি জীবন দিয়ে মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান বানী পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, মুহাম্মাদ সঃ আল্লাহ্র প্রেরিত শেষ নাবী ও রাসুল। তাঁর ইন্তেকালের পর সকল সাহাবী, তাবে-তাবেঈন, মহান সাধকগণ দ্বীনের প্রচার প্রসার করে গিয়েছেন। বর্তমানকালেও ধারাবাহিক যুগের মৌলবি-মাওলানা, পীর-মাশায়েখগণ, বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের বা জামাতের কর্মীরা এই ইসলামের প্রচার প্রসার করছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন বা অনেকেরই প্রশ্ন করতে পারেন যে, ইসলাম প্রচার প্রসারের দায়িত্ব শুধুমাত্র তাদেরই কেন? বাকী মুসলিমদের কি এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে? বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ ডিগ্রীধারী মুসলিম ছাত্রদের কি কোন দায়িত্ব নেয়? অথচ সোশ্যাল মিডিয়ায় এরাই ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করে থাকেন। এমনকি এরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ (Secular), উদার, পরমতসহিষ্ণু দাবী করে, আবার ইসলাম, মুসলিম, কুরআন, পর্দার বিধান, তালাক্ব, আখিরাত সম্পর্কে নিজেদের ক্ষোভ, বিদ্বেষ, নীতিবাচক মন্তব্য করে থাকেন এবং অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। অত্যন্ত আফসোস ও দুঃখের বিষয়! যাদের দায়িত্ব ছিল অন্য মানুষের নিকট ইসালামের সুমহান বানী পৌঁছে দেওয়ার, তারা তাদের সে দায়িত্ব পালন তো করছেনা বরং যারা এই দাওয়াতি কাজে নিয়োজিত আছে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে, নীচু দৃষ্টিতে দেখে। অথচ মহান আল্লাহ্র নিকট দ্বীনের প্রচারকারীদের সম্মান এবং মর্যাদা অনেক বেশি। সুরা হামীম আস সাজদাহ এর ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কার হতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, সৎ কাজ করে এবং বলে আমি মুসলমান।"

তাই আসুন জানা যাক, ইসলামের বানী প্রচার প্রসারে উম্মাতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব কতটা। বিশেষ করে আল্লাহ্র দ্বীনের মত নিয়ামত থেকে যারা বঞ্চিত তাদের নিকট এ বানী পৌঁছানোর জন্য এবং নিজেদের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের উচিৎ হল ইসলামের প্রচার-প্রসার চালিয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে সূরা মুদ্দাসসিরের ১-৩ নং আয়াতে নবী (সঃ) কে

সম্বোধন করে সকল মুমিন-মুত্তাকীদেরকে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

"হে চাদর আবৃতকারী! ওঠ আর সাবধান করো এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।"

তাছাড়া সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ আরো বলেন -

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই হচ্ছো শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের প্রেরণ করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে।"

ইসলাম প্রচারের জন্য শুধুমাত্র মাদ্রাসাতে পড়ে ডিগ্রি অর্জন করতেই হবে এমনটি ঠিক নয়, মাদ্রাসাতে পড়ে জ্ঞান অর্জন করা অবশ্যই ভালো। তবে মাদ্রাসা ছাড়াও যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তারাও যে কুরআন-হাদিস গবেষণা করে ইসলামের দায়ী হতে পারে, এর অসংখ্য উদাহরণ মওজুদ আছে। কারণ ইসলামের জ্ঞান বলেন বা দুনিয়াবী জ্ঞান বলেন, দুনিয়ার কোন মানুষেরই ১০০% জ্ঞান নেই। সীমাহীন জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামীন। তাই ইসলাম তথা কুরআন ও হাদিস অধ্যায়ন করে আপনি যতটুকু বুঝছেন, আপনার দায়িত্ব হল সে বানীটুকু অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই তো রাসুল (সঃ) বলেন- بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল (সঃ) বলেন- "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা অন্য মানুষের নিকট পৌঁছে দাও।" তাহলে আমরা জানতে পারলাম প্রত্যেকটা উম্মাতে মুসলিমাকে একটি আয়াত অন্যভাবে বললে পরিমানে খুব কম হলেও নবীর সঠিক বানীটা অন্যদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে - كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسئول عن رَعِيَّتِهِ "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর সবাইকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" (বুখারী- ৭১৩৮, আবু দাউদ - ২৯৭০, মুসলিম- ৪৮২৮)

এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট ধারণা পেলাম যে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য মানুষকে জাহান্নামের আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আমারা যে যে স্তরেই থাকি না কেন, যে পেশার সাথেই যুক্ত থাকি না কেন- সবাই দায়িত্বশীল। হতে পারে আপনি বিদ্যালয় ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, ইমাম- কিন্তু প্রথমে আপনাকে ইসলাম তথা দ্বীনের দায়ী হতে হবে। সেটা সম্ভব হলেই বিশ্বের সকল জায়গায়, সব স্তরে ইসলামের সুমহান বানী পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

তাই আসুন, আমরা সকল স্তরের মানুষ ইসলামকে ভালভাবে জানি, বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করি। যতটুকু আমরা জ্ঞান অর্জন করবো, বিশ্বের বাকী মানুষদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্। কেননা এই গুরু দায়িত্ব শুধুমাত্র দু-একটা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমরা প্রত্যেকেই দ্বীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যায়। শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়াতে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে, নেতিবাচক কথা এড়িয়ে গিয়ে আপনিও হয়ে যান দ্বীনের প্রকৃত দায়ী, তথা একজন আদর্শ দায়িত্বশীল। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোওয়া থাকবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসাহ, মাসজিদের ইমাম, ছাত্র-শিক্ষক সকলেই যেন আমরা দ্বীনের প্রচারক হয়ে যায় এবং ইহকাল ও আখিরাতের জীবনে নাজাত পেয়ে যায়। আমীন।

> কেউ হেদায়েতের দিকে আহ্বান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবেনা।
>
> সহিহ মুসলিম - ২৬৭৪

বিশেষ প্রবন্ধ

ইসলামী আন্দোলন ও ক্যারিয়ার

মুরশিদ আলী

ইংরেজি CAREER শব্দটির বাংলায় এককথায় অর্থ হচ্ছে জীবনোপায়। অর্থাৎ জীবিকা উপার্জনের পথ ও পন্থা। CAREER DEVELOPMENT মানে হচ্ছে জীবিকা উপার্জনের পথ ও পন্থার ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন এবং জীবনে সমৃদ্ধি অর্জন। অক্সফোর্ড ডিক্শনারিতে ক্যারিয়ারকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, A PERSON'S COURSE OR PROGRESS THROUGH LIFE. অর্থাৎ একজন মানুষের জীবনে ধারাবাহিক উন্নয়ন সাধিত হওয়া। পেশা বা বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডে সফলতাই হচ্ছে ক্যারিয়ারের সফলতা। অন্যভাবে বললে, জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এমন পেশা নির্ধারণ করা যেখানে ব্যক্তির জীবন-জীবিকার উন্নয়ন সাধিত হয়ে থাকে। ক্যারিয়ার গঠন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। বর্তমান শিক্ষিত তরুণ সমাজ ও তাদের অভিভাবকগণ ক্যারিয়ার নিয়ে এখন বেশ উদ্বিগ্ন। পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে কিভাবে সম্মানজনক উপায়ে জীবিকা উপার্জন করা যায় এ নিয়ে থাকেন তটস্থ।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করছেন, সমাজ বিপ্লবের কাজ করছেন ক্যারিয়ার উন্নয়নে তারা অত্যন্ত মনোযোগী থাকেন। তাঁদের ক্যারিয়ার ভাবনার মূল লক্ষ্য থাকে পরকালিন সফলতা। মৃত্যু পরবর্তি জীবনে সাফল্য লাভ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যক্তিজীবনে যে পরিমাণ জাগতিক উন্নয়ন সাধিত হওয়া দরকার তাঁরা ততটুকুই করেন। পুঁজিবাদ, সেক্যুলার অর্থ্যাৎ বস্তুপূজারিদের মত বল্গাহীন ও দুনিয়াকেন্দ্রীক একচেটিয়া ক্যারিয়ার উন্নয়নে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা বিশ্বাসী নন। বিশেষ করে যারা ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ক্যারিয়ার গঠনের ব্যাপারে তারাই সবচেয়ে বেশি মনোযোগী থাকেন। দ্বীনি আন্দোলনের কঠিন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ভালো পড়াশোনা করা ও উন্নত ক্যারিয়ার গঠন অনেকের দ্বারা দু:সাধ্য মনে হতে পারে। কিন্তু একটি সুসংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল কাঠামোর মধ্যে থাকলে অনেক কঠিন কাজও সহজসাধ্য হয়ে যায়। ছাত্র ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে সে কাঠামোগুলোর মধ্যে একটি। এখানে কর্মী- দায়িত্বশীলগণ যেহেতু সবাই ছাত্র থাকেন, সেহেতু নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা ও সাংগঠনিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষায় একে অপরের প্রতি সহযোগী হতে পারেন। ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে আনুগত্য-শৃঙ্খলা এবং নিষ্ঠার সাথে যিনি দায়িত্ব পালন করেন, কর্মজীবনেও কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার উন্নয়নে তিনি অনেক অনেক বেশি সফল হতে পারেন। তবে কিছু কর্মী রয়েছেন যারা ক্যারিয়ার BUILD UP (গড়ার) করার পূর্বেই SACRIFICE (বিসর্জন) করে ফেলেন! অথচ অ্যাকাডেমিক ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে আগে ক্যারিয়ার গড়তে হয়, তারপর বিসর্জন দেয়া না দেয়ার প্রশ্ন আসে। প্রকৃত ক্যারিয়ার স্যাক্রিফাইস তখনই হবে যখন ক্যারিয়ার গঠনের পর অর্থ্যাৎ উপার্জনের সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধাবলী অর্জনের পর আপাত: সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের কারণে তা পরিত্যাগ করেন অথবা দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেন। এ ধরণের ত্যাগ-কুরবানিই জনশক্তিদের জন্য প্রেরণার উৎস এবং পরকালীন সাফল্য লাভের পাথেয় হতে পারে।

একথা সত্য সেক্যুলার আন্দোলন যারা করেন বা জাগতিক ধ্যান ধারণা যারা লালন করেন তাদের সাথে পড়াশোনা কিংবা উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের প্রতিযোগিতায় নিজেদের টিকিয়ে রাখা ইসলামপন্থীদের জন্য অনেক কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে মেধাবী এবং অধ্যাবসায়ী কর্মীরাই পারেন

সেক্যুলারদের সমকক্ষতা অর্জন করতে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সেক্যুলারদের পিছনেও ফেলে দেন। অনেক কম মেধাসম্পন্ন কর্মীও কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থেকে সফল হচ্ছেন। এসব জনশক্তি শুধু মেধায় দক্ষ নন নৈতিকতার মানদণ্ডেও সর্বোচ্চে অবস্থান করছেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এক মহান মিশনারি চিন্তা-চেতনা নিয়ে তাঁরা গড়ে উঠেন। যা হচ্ছে ইসলামকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চে তুলে ধরার মিশন, পরকালীন নাজাতের মিশন, জান্নাত লাভের মিশন। মিশর, তুরস্ক, তিউনিশিয়াসহ অনেকগুলো মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার উন্নয়নে সেক্যুলারদের চেয়ে অনেক শীর্ষে অবস্থান করছেন। সেখানে দেখা যায় যে নেতৃবৃন্দ রাজনীতি বা দলীয় কর্মকান্ডকে-কে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করে স্বীয় একাডেমিক অথবা অন্যকোন যোগ্যতার সর্বোচ্চ প্রদর্শণ করে কর্মজীবনে সফল হচ্ছেন।

যেমন কোন দায়িত্বশীল একদিকে একটি ইসলামী দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপালন করছেন অন্যদিকে দেশ সেরা প্রকৌশলী, ডাক্তার, স্কলার অথবা অধ্যাপক হিসেবে সমধিক পরিচিত আছেন। সাধারণ মানুষের কাছে তাদের রাজনৈতিক বা দলীয় পরিচয়ের চেয়ে সামাজিক পরিচয়টাই মুখ্য থাকে। এ কারণে সেসব অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলনগুলোর গণভিত্তিও তত মজবুতি লাভ করেছে এবং কর্মীবহুল দলের চেয়ে ব্যাপক জনসমর্থিত দলে পরিণত হয়েছে। তাই আপাত ভোটের রাজনীতিতেও তারা সফল হচ্ছেন। শিক্ষিত বেকার (UNEMPLOYED) এবং আংশিক-বেকারের (UNDEREMPLOYED) সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রথম দিকে অবস্থান করছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। তাছাড়া প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি থাকায় প্রবাসেও রপ্তানি করা যাচ্ছে না এখানকার অল্পশিক্ষিত বিশাল শ্রমশক্তি। ঘুষ-দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে বৈধভাবে সরকারি চাকুরি গ্রহণ এবং টিকে থাকা এখানে বড় দায়। বি.সি.এস.সহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় অতিরিক্ত কোটাপ্রথা মেধাবীদেরকে সরকারি চাকুরির প্রতি হতাশ করছে। একমাত্র প্রাইভেট কর্পোরেট কিংবা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোই এখন মেধাবী তরুণদের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু এখানেও ভালো ক্যারিয়ার গড়তে গেলে এমন কিছু প্রফেশনাল ডিগ্রী থাকতে হয় যেগুলো অর্জন ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। এতসব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের কর্মীদের উপরোক্ত ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা সত্যিই চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। তবে গতানুগতিকতার বাইরে এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ইসলামপন্থীরা অনায়াসেই ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন। যেখানে রয়েছে সম্মান এবং উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দ্বীনি আন্দোলনের মিশনারি কাজের অংশ হিসেবেও এসব ক্ষেত্রকে তারা ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিতে পারেন। বর্তমান বিশ্ব ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ক্যারিয়ার গড়তে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা উচিত।

গণমাধ্যমকর্মী/সাংবাদিকতা:

ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্টেড মিডিয়ায় ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যে কোন অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে এখানে ক্যারিয়ার গড়া যায়। সাংবাদিকতায় সম্মানের সাথে টিকে থাকার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হচ্ছে সৎ সাহস। তবে সরকারি রোষানল, কর্পোরেট মাফিয়া চক্র ও দুর্নীতিবাজদের মোকাবেলা করে খুব কম সংখ্যক মিডিয়া এবং সংবাদকর্মীই এখানে টিকে থাকতে পারে। সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণে আধুনিক গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষকে মোটিভেট করা, আন্দোলিত করা কিংবা শিহরিত করার মত যাদুকরি ক্ষমতা থাকে মিডিয়া কর্মীদের। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে এখানে ভূমিকা পালন করার জন্য ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসা উচিত। কারণ এখানে হলুদ সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো,

জাতিকে সঠিক তথ্য দেয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উন্মোচন করতে খোদাভীরু মিডিয়াকর্মীর বড়ই অভাব। তবে মুসলিম উম্মাহর প্রতি উৎসর্গিত ও শক্তিশালী মিশনারি লক্ষ্য না থাকলে এসব মিডিয়া এবং সাংবাদিকদের এখানে টিকে থাকা কষ্টসাধ্য।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অঙ্গন

যে দেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে যত শীর্ষে সে দেশ এখন তত সমৃদ্ধশালী ও উন্নত। ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধনই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষতা। কত কম সময়ের মধ্যে বেশি পরিমাণ তথ্য বা ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং নির্ভুলভাবে প্রেরণ করা যায় তাই নিয়ে গবেষণা করাই হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যা। বর্তমানে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবস্থার উৎকর্ষতাই তথ্যপ্রযুক্তির বিদ্যার সবচেয়ে বড় সফলতা। উন্মুক্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ব্লগ, অনলাইন নিউজপোর্টাল, ভিডিও শেয়ারিং প্রভৃতি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজস্ব মতাদর্শ প্রচার, প্রসার এবং বিরোধী পক্ষের অপপ্রচারের জবাব দেয়া এখন অত্যন্ত সহজ কাজ। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী এবং নিপীড়িত ও মজলুম জনগোষ্ঠীর কাছে তাই অনলাইন মিডিয়াগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়। বর্তমান জীবন-জীবিকার এমন কোন ক্ষেত্র অবশিষ্ট নেই যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পৌঁছায়নি।

দেশের সরকারি সেবা, ব্যবসায-বাণিজ্য, লেনদেন, ব্যাংকিং, মার্কেটিং, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, আবাসন সবক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তি পৌঁছে গেছে। তাই এই ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মক্ষেত্রও সৃষ্টি হয়েছে। কম্পিউটারের উপর ৬ মাস থেকে ১ বছরের যেকোন ডিপ্লোমা কোর্স করে দক্ষতার সাথে এ ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করা যায়। তাছাড়া ঘরে বসে অনলাইন ফ্রিলেন্সিং বা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করেও সম্মানজনক জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। ফ্রিলেন্সাররা মূলত বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে (যেমন: FREELANCER.COM, FIVERR.COM, UPWORK.COM প্রভৃতি কয়েক হাজার অনলাইন বাজারে) তাদের পণ্য বা সেবা বিক্রয় করেন অথবা নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট কাজের জন্য গ্রাহক কর্তৃক ভাড়ায় খাটেন এবং উপার্জিত অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে নির্ঝঞ্ঝাটে দেশে নিয়ে আসতে পারেন।

শিক্ষকতা:

একমাত্র মাদ্রাসা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন শিক্ষার সুযোগ নেই। অথচ সিংহভাগ জনগোষ্ঠী প্রচলিত সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় পড়াশোনা করে আসছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি পরিপূর্ণ ইসলামী আদর্শের আলোকে ঢেলে সাজানো সম্ভব নয়। ততদিন পর্যন্ত ইসলামী নীতিমালা ও মূল্যবোধ শিক্ষা থেকে সিংহভাগ মানুষ বঞ্চিত থাকবে, ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত জীবন ব্যবস্থা প্রাধান্য পেতে থাকবে তা হয় না। তাছাড়া সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার এ ধারা অব্যাহত থাকলে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের আন্দোলনও দিন দিন আরো বাধাগ্রস্থ হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের স্কুল-কলেজগুলোতে শিক্ষকতা তথা মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

শিক্ষা কারিকুলামে যাই থাক না কেন একজন আল্লাহভীরু শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকলে ছাত্ররা আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রেরণা পায়, খোদাভীতি চর্চার কিছু প্রশিক্ষণ পায়। এ ধরণের ছাত্রদের মধ্যে যাদের সরাসরি ইসলামী আন্দোলনে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য হয় না, তারা স্বেচ্ছায় অন্তত আন্দোলনের বিরোধীতা করবে না কিংবা ইসলামের মর্যাদাহানি করবে না। যাদের অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা ভালো, ইসলামী আন্দোলনের সে সকল কর্মীদেরকে শিক্ষকতার মহান পেশায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, ব্যাংক-বীমা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে বেশি বেতনে চাকুরি করার চেয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে শরিক থাকতে পারাটা অনেক বেশি মর্যাদাকর, অনেক বেশি সওয়াবের কাজ হবে।

ইসলামপন্থী শিল্প ও ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাগণ যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার প্রতি আরো মনোনিবেশ করেন তাহলে জাতির অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তির উপায় দ্রুততর হতে পারে।

সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি অঙ্গন:

সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে যেকোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা যায়, কোন বিশেষ একাডেমিক সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন সৃজনশীলতা ও মননশীলতার পরিচর্চা। হুট-হাট করে কেউ সাহিত্যিক অথবা বুদ্ধিজীবি হয়ে যেতে পারেন না। সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি হতে হলে মোটামুটি এমন বৈশিষ্ট্যাবলী থাকা প্রয়োজন, যেমন: যারা নিয়মিত ডায়েরি সংরক্ষণ করে থাকেন, পত্রিকার কলাম-সাহিত্য পাতা নিয়মিত পড়েন, সংরক্ষণে রাখেন, সুন্দর উপস্থাপনায় স্মৃতি রোমন্থন করতে পারেন, নামকরা কবি-সাহিত্যিকের লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়েন ও নিজ থেকে লেখার চেষ্টা করেন, ইতিহাসের ভালো জ্ঞান রাখেন, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, যেকোন জিনিস নিখুঁতভাবে ভাবতে পারেন, খুঁটিনাটি বিষয়েও যাদের চোখ এড়ায় না, নিজের মধ্যে আলাদা স্বকীয়তা অনুভব করেন প্রভৃতি। জাতির দিকনির্দেশক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবি মহল এখান থেকেই বের হয়ে আসেন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্য চর্চায় ইসলামপন্থীরা এখনো পিছনে পড়ে আছেন, এই সেক্টরে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার সময় এসেছে। সাম্রাজ্যবাদিদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে পিষ্ট ও প্রভাবিত বুদ্ধিজীবি পরিমণ্ডলকে এখান থেকে দ্রুত মুক্ত করে নিয়ে আসতে হবে।

শিশু সংগঠক :

কোমলমতি শিশুদের সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন রয়েছে শিশু সংগঠনের বর্তমানে প্রচলিত অধিকাংশ শিশু সংগঠন বিজাতীয় সংস্কৃতির পরিচর্চা কেন্দ্রমাত্র। শিশুতোষ গান, ছড়া, কবিতা, সাহিত্য, পত্রিকা, নাটক, গল্প প্রভৃতি চর্চাকেন্দ্র হচ্ছে শিশু সংগঠনগুলো।শিশু-কিশোরদের সাথে মিশতে পারা, মন-মানসিকতা বোঝা এবং প্রাণবন্ততা প্রভৃতি গুণাবলী শিশু সংগঠকদের থাকতে হয়।শিশু সংগঠন গড়ে তোলার জন্য দরকার উপযুক্ত আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা। কারণ শিশুদের বিনোদন উপকরণাদি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হতে হয় যা ব্যয়বহুল। তবে জাতীয় সংগঠনের উদ্যোগ থাকলে এ ধরণের সংগঠন গড়ে তোলা এবং এখানে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করা খুব সহজ হয়।

নাট্যগোষ্ঠী :

নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ ধরণ যা পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে অভিনয় করা হয়। সমাজ বাস্তবতার অনেকাংশই নাটক দিয়ে সহজে উপস্থাপন করা যায়। শুধু বিনোদনের জন্য নয়, নাটকের মাধ্যমে সমাজ সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও ধর্মীয় অনুভূতিও জাগ্রত করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্যাঙ্গনগুলো অশ্লীলতা ও অপসাংস্কৃতিক সয়লাবে অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে শিক্ষামূলক নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ করার দিকে এগিয়ে আসা উচিত। ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বর্তমান যুগে নাটক-সিনেমা অন্যতম অবদান রাখতে পারে। তবে তা অবশ্যই হতে হবে প্রচলিত নীতিমালা অথবা চর্চার মধ্যে যতটুকু শরিয়া সমর্থন করে না তা বাদ দিয়ে। বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতাকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক আগ্রাসণ প্রতিরোধ এবং ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় শরিয়া বিশেষজ্ঞগণ এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত অভিমত ব্যক্ত করবেন এটাই উম্মাহর প্রত্যাশা।

সঙ্গীত শিল্পী:

কণ্ঠস্বর ও ধ্বনীর সমন্বয়ে সঙ্গীতের সৃষ্টি। ধ্বনী হতে পারে মানুষের কণ্ঠ নি:সৃত অথবা যন্ত্র উৎপাদিত শব্দ। ধ্বনীর প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সুর। ধ্বনী, সুর ও তালের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সঙ্গীত বা গান। এক্ষেত্রে যন্ত্র উৎপাদিত ধ্বনী ছাড়া বাকি সবগুলোই শরিয়া সমর্থন করে। বিধায় দেশে ইসলামী সঙ্গীত শিল্পী ও শিল্পীগোষ্ঠীর তৎপরতা আশাব্যাঞ্জক। তবে সঙ্গীত শিল্পে প্রধান অবস্থান

সৃষ্টি করতে ইসলামী সঙ্গীতশিল্পী ও কলা-কুশলীদেরকে আরো বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। ক্যারিয়ার হিসেবে সঙ্গীত ও ক্বেরাত শিল্পে তাদেরই এগিয়ে আসা উচিত যারা কণ্ঠ অনুশীলনে ভালো এবং শুধুমাত্র দ্বীনি মিশনারি কাজ হিসেবে একে গ্রহণ করতে পারবেন।

মাদ্রাসার শিক্ষক ও ইমাম-খতিব:

মসজিদ-মাদ্রাসাসমূহ দ্বীনের শ্রেষ্ঠ মারকাজ বা আবাদস্থল। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবেও বর্তমানে মসজিদ-মাদ্রাসার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ সমস্ত দ্বীনি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণ মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা এবং যথেষ্ট সম্মানবোধ রয়েছে। কারণ তারা এগুলোকেই নি:স্বার্থ ও একমাত্র আখেরাতের কাজ বলে মনে করে। ইসলামী আন্দোলনকে পছন্দ করে না কিন্তু মসজিদ-মাদ্রাসার প্রতি, এসবের তত্ত্বাবধায়কগণের প্রতি অধিকাংশ মানুষের রয়েছে অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি-শ্রদ্ধাবোধ।

যারা সরাসরি মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন করছেন, তাদের ক্যারিয়ার শুরু করা উচিত মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোতে দ্বীনি খেদমতের মাধ্যমে। মাদ্রাসা পরিচালনা অথবা প্রতিষ্ঠা, ছাত্র পড়ানো, ইমাম হিসেবে খুতবা প্রদান, মসজিদ ভিত্তিক দ্বীনি তালিম-তরবিয়ত, ওয়াজ মাহফিল, ইসলামী আলোচনা সভা প্রভৃতি কার্যক্রম নি:সন্দেহে দ্বীন প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর অন্যতম। ব্যবসায়-বাণিজ্য অথবা জাগতিক কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করার চেয়ে মসজিদ-মাদ্রাসাসমূহে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা, শত শত যোগ্য আলেম তৈরি করা, সাধারণ মানুষের দ্বীনি তালিম-তরবিয়তের ব্যবস্থা করার মর্যাদা যে কত বেশি, কত সওয়াবের কাজ তার স্পষ্ট সুসংবাদ আমরা হাদীসে রাসুল (স:) থেকে পাই।

মাদ্রাসা পড়ুয়া ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ যারা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চতর ডিগ্রী নিচ্ছেন, তাদের ক্যারিয়ারের শুরুটাও মসজিদ-মাদ্রাসা থেকেই শুরু করা উচিত। যদিও আর্থিকভাবে যথেষ্ট স্বচ্ছলতা আনয়ন এখানে থেকে সম্ভব নয় তারপরও শুরুর কয়েক বছর এখানে থাকা উচিত। পরবর্তিতে একটা পর্যায়ে জাগতিক অন্যান্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়া যেতে পারে। তবে যেখানেই যাওয়া হোক না কেন দ্বীনি পরিচয় অর্থাৎ তাঁর আলেম হিসেবে পরিচয়টা প্রাধান্য পাওয়া উচিত। কওমি মাদ্রাসা ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে এমন কিছু মাদ্রাসা অথবা স্কুল প্রতিষ্ঠায় নিজে উদ্যোক্তা হওয়া কিংবা অন্যকে উৎসাহিত করার কাজ তাঁরা করতে পারেন। এভাবে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তালেবে এলেমগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন ।

আইনপেশা:

ন্যায় বিচার প্রাপ্তি মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে একটি। মানবরচিত মতবাদ বা জীবন ব্যবস্থার আলোকে রচিত আইন বা বিধানাবলী যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। এ সমস্ত আইনের অধিকাংশই মূলত প্রথাগত ও পরীক্ষামূলক হয়ে থাকে যা মানুষের শুধু দুর্ভোগ-ভোগান্তিই বাড়িয়ে থাকে। ঠিক তেমনই যেমন রোগের মূল কারণ চিহ্নিত না, ডায়াগনসিস না করে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখে ওষুধ দিয়ে দেয়া। ফলে রোগী সাময়িক সুস্থতাবোধ করলেও কিন্তু রোগ থেকেই যায় এবং তা আরো জটিল আকার ধারণ করে। তাই সকল জুলুম ও অবিচারের উৎস হচ্ছে মানুষের মনগড়া আইন-কানুন। রাব্বুল আলামীন আল্লাহর বিধানই শতভাগ ত্রুটিমুক্ত এবং ন্যায়বিচারের উৎস-এটাই মুসলিমদের দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ সুমহান সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনিই সবকিছু জানেন কোথায় মানুষের আসল সমস্যা এবং কি তার সমাধান-এই বিশ্বাস হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক।

রাষ্ট্রীয় কাঠামোয়ে সেই বিধান প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত প্রচলিত বিধানে থেকে যতটুকু সম্ভব মানুষকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দেয়া এবং দুর্ভোগ লাঘব করে দেয়া নি:সন্দেহে অনেক সওয়াবের কাজ। তাছাড়া সততার সাথে আইন পেশায় যথেষ্ট স্বাধীনতা, সম্মান এবং আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা রয়েছে।

যারা অনার্স-মাস্টার্স অথবা ডিগ্রী-মাস্টার্স করেছেন তারাই এডভোকেটশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মাধ্যমে জজকোর্টে আইন পেশা শুরু করতে পারেন। পরবর্তিতে আরো পরীক্ষা দিয়ে সুপ্রীম কোর্টেও প্র্যাক্টিস করতে পারেন। তাছাড়া হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিচারক হিসেবেও নিয়োগ পেতে পারেন। তবে বর্তমান কাঠামোয়ে সৎভাবে বিচারক হিসাবে দায়িত্বপালন করা কিংবা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরকাল ধ্বংসের কারণও হতে পারে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আইন পেশাকে স্বেচ্ছাসেবা হিসেবে গ্রহণ করা কিংবা নামমাত্র মূল্যে সেবা দেয়া এবং এই পেশায় সৎ-দক্ষ জনবল বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করা উচিত।

এনজিও, স্বেচ্ছাসেবি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার:

নন গভার্নমেন্ট অরগানাইজেশন বা NGO যার বাংলা অর্থ হচ্ছে বেসরকারি সেবা সংস্থা। এগুলো হচ্ছে অলাভজনক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যার কোনটা নামমাত্র মূল্যে, কোনটা বিনামূল্যে মানুষকে বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে। যেমন: আইন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্ষুদ্র ঋণ, পরিবেশ, শৃঙ্খলা, উদ্ধার, পুনর্বাসন, আবাসন, খাদ্য, মাতৃত্ব সেবা প্রভৃতি। এসবের কোনটার আংশিক অর্থায়নে রয়েছে সরকার, কোনটার পূর্ণাঙ্গ অর্থায়নে কোন সুহৃদয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা আন্তর্জাতিক কোন সংগঠন বা সংস্থা। এনজিওগুলোর মধ্যে কোনটার জনবল স্বেচ্ছাসেবী, কোনটার জনবল বেতনভুক্ত হয়ে থাকে।

মানবতার কল্যাণে যেকোন দাতব্য, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবাকে হাদীসের ভাষায় তিনটি সদকায়ে জারিয়া বা অবিরত পুন্য কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এমন এক পুণ্য যা ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার মৃত্যুর পরও ততদিন অব্যাহত থাকবে যতদিন মানুষ সে সেবা বা উপকার পেতে থাকে। ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রেও এনজিও, স্বেচ্ছাসেবি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মানুষ যখন ইসলামপন্থীদের নিকট থেকে তার মৌলিক কিংবা অতিপ্রয়োজনীয় সেবাগুলো বিনামূল্যে কিংবা কমমূল্যে পেতে থাকবে তখন তার ঈমানও রক্ষা পাবে। কারণ দারিদ্র্যতা মানুষকে কুফুরির দিকে ধাবিত করে। অর্থ্যাৎ ইসলামপন্থীরা এগিয়ে না আসলে ইসলাম বিরোধী মহল সেবার বিনিময়ে তাদের উপর নিজস্ব মত-পন্থা চাপিয়ে দিবে কিংবা প্রলুব্ধ করবে। যেমন পার্বত্যাঞ্চল, উত্তরাঞ্চলসহ দেশের দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলগুলোতে খৃস্টান মিশনারি, আহমদিয়া (কাদিয়ানী) এবং নাস্তিক সম্প্রদায় দরিদ্র মুসলমানকে ঈমানহারা করে যাচ্ছে। তাই নিজেই উদ্যোক্তা হওয়া অথবা কোন সামর্থবান ও সম্পদশালী মুসলিমকে উদ্যোগি করে এসব সেবামূলক কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

গ্রামে গ্রামে মসজিদ ও মাদ্রাসাভিত্তিক কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা এবং এসবের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ সামর্থ অনুযায়ী প্রদান করা যেতে পারে, যেমন: বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, কুরআন হিফয, বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা, নিয়মিত কুরআন-হাদীসের দারস, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে উৎসাহ, রমযান মাসে রোজার পরিবেশ রক্ষা, মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা, সাপ্তাহিক ফ্রি রোগ নির্ণয় (ডায়াগনসিস), প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ তৎপরতা, আপদকালীন স্বেচ্ছাসেবা, হোমিও ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সেবা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা এবং উন্নয়ন, কৃষি ও খামার বিষয়ক পরামর্শ, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা, আইনী পরামর্শ ও সেবা, মাদক ও অসামাজিক এবং জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম বিরোধী সচেতনতা, মহিলাদের প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান ও মাসআলা শিক্ষা, বেকার যুবক ও মহিলাদের দিয়ে কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠা ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী, নির্মল আনন্দ ও বিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি। সারাদেশের বর্তমান মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোকে এক একটি মার্কাজ হিসেবে গ্রহণ করে উপরোক্ত দ্বীনি ও সমাজসেবা কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া যেতে পারে।

সেবাসমূহ কোনটা বিনামূল্যে, কোনটা নামমাত্র মূল্যে প্রদান করা হবে। এখানে বিধিমোতাবেক বেতনভুক্ত জনবল থাকবে এবং তা নিয়মিত আয় অথবা যাকাত বা অন্যান্য অনুদান থেকে প্রদান করা হবে। তবে এধরণের সেবাক্ষেত্রগুলো প্রতিষ্ঠালাভ

করলে একপর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী ও ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর চক্ষুশূলে পরিণত হয় এবং সরকারি অনেক বিধিনিষেধের বেড়াজালে পড়তে হয়। তবে দ্বীনি মিশনারি লক্ষ্য না থাকলে, আল্লাহর দ্বীনকে সর্বস্তরে বিজয়ী করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ না থাকলে মুসলিমদের পক্ষে এসব প্রতিষ্ঠান গড়া ও পরিচালনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। খৃস্টান মিশনারি সংগঠনগুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে মুসলিম দেশে এভাবেই কাজ করে যাচ্ছে এবং ধর্মান্তরিতের কাজে সফল হচ্ছে। ইসলামী সমাজ বিপ্লবের কর্মীরা ফুল টাইম (নির্ধারিত বেতনে) অথবা পার্ট টাইম (স্বেচ্ছাসেবা) কাজ হিসেবেও স্ব-স্ব এলাকায় এসব সেবামূলক কর্মকাণ্ডে মগ্ন হতে পারেন। একক অথবা গুচ্ছগ্রাম ভিত্তিক উপরোক্ত সেবাসমূহ সামর্থানুযায়ী প্রদানের মধ্য দিয়ে দেশে এক একটি আদর্শ ও স্বনির্ভর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আধুনিক যুগের প্রভাবশালী ইসলামী স্কলার এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী আন্দোলনগুলোর আধ্যাত্মিক রাহবার ড. ইউসুফ আল কারযাভির সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ আলোচনার প্রাসঙ্গিক বলে এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, 'কিছু কিছু ইসলামী আন্দোলন এখন রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত। তাদের সমস্ত সংগ্রাম, সাধনা রাজনীতিতেই লোক সমাগম করা। তাদের চিন্তা, অনুভূতি ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সবই অনৈসলামিক সরকারের বিরুদ্ধে নিয়োজিত। তাদের শক্তি-সামর্থ সরকার যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ক্ষয় করতে হচ্ছে। কিংবা এমন যুদ্ধে তাদের জড়িয়ে পড়তে হয় যেখান থেকে না ইসলামের কোন উপকার হয়, না দেশের। এই অনাকাঙ্খিত যুদ্ধ যুগের পর যুগ চলতে থাকার কারণে একদিকে যেমন শক্তির অপচয় হয়, অন্যদিকে ইসলামের শত্রুরা অত্যন্ত আনন্দ পায়। অথচ এরা অনেক ধরণের ভালো, উপকারি, জরুরি এবং সম্ভাবনাময় কাজ থেকে বেশ দূরে থাকে। তারা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সময় দেয় না। ওরা শিক্ষা-প্রশিক্ষণেও সময় বেশি লাগায় না। সামাজিক কর্মকাণ্ডে এদের সময় একদম নেই। অথচ এই কাজগুলো কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকা-থেকে আলাদা নয় বরং রাজনৈতিক সফলতার জন্য এগুলোকে অবশ্যই করণীয় কাজ হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে নিয়েছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সফলতা লাভ করতে হলে আমাদের উচিত এমন এক জেনারেশন তৈরি করা যারা দ্বীনকে বুঝবে পরিপূর্ণভাবে। যারা দুনিয়ার জ্ঞানেও পিছিয়ে থাকবে না। আকিদা-বিশ্বাস হবে একদম নির্ভেজাল । যারা ইবাদত করবে সহিহ্ সঠিক পন্থায়।'

ইসলামপন্থীদের এই মুহূর্তে দল, মত বা পন্থী পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ক্যারিয়ার উন্নয়নে ব্যাপকভাবে মনোনিবেশ করা উচিত। এসব সেক্টরে ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠা, দ্বীনি ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই দল, পন্থা অথবা গোষ্ঠী ট্যাগমুক্ত রেখে সার্বজনিন হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত। সেবার বিনিময়ে সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিল, নোংরা রাজনৈতিক ফায়দা লাভ, পরবর্তিতে খোঁটা দেয়ার মানসিকতা, সেবা প্রাপ্তিতে নিজ পন্থীয় ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দান প্রভৃতি দলীয় বা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করার মতো উপরোক্ত বর্ণনার বাইরেও ইসলামপন্থীদের জন্য আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে। মূলত জীবিকার ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম প্রত্যেক মুসলমানের উপর সামর্থানুযায়ী ফরজ। সে হিসেবে সকল ধরণের হালাল ক্যারিয়ারে থেকেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নেয়া যায়। তবে আমার মতে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে ইসলামপন্থীদের এই মুহূর্তে বেশি মনোযোগী হওয়া দরকার। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে তাঁর দ্বীনের অভিমুখি করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টি দান করুন।

"ইসলাম জিতবেই, তোমাকে নিয়ে অথবা তোমাকে ছাড়া। কিন্তু ইসলাম ছাড়া তুমি হারিয়ে যাবে এবং হেরে যাবে।"

— আহমেদ দীদাত (রহ.)

হজ্ব ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ

মসিউর রহমান

আল্লাহ্ সুবহানাতাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন- "আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাবাগৃহে যাতায়াতের জন্য সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর হজ্ব করা ফরজ।"

হাদীসে এসেছে, আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন, "অনিবার্য প্রয়োজন কিংবা অত্যাচারী শাসক অথবা কঠিন রোগ যদি (সামর্থ্যবান) কোন ব্যক্তিকে হজ্ব পালনে বিরতে না রাখে, তবে সে যদি হজ্ব পালন না করে মারা যায়, সে যেন ইহুদি ও নাসারার মতই মৃত্যুবরণ করে।" (দারেমি-১৮২৬)

হজ্ব শব্দটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করা, দর্শন করা প্রভৃতি।

ইসলামী শারিয়াতের পরিভাষায় বলা যায় আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্ধারিত তারিখে, নির্দিষ্ট স্থান গুলো যিয়ারাত করার সঙ্কল্প বা ইচ্ছা করাকে হজ্ব বলা হয়।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্ব একটি অন্যতম। যাদের আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে তাদেরকে অন্ততপক্ষে জীবনে একবার হজ্ব পালন করা ফরজ বা বাধ্যতামূলক।

হজ্ব মুসলিমদের জন্য বিশ্ব সম্মেলন, ভ্রাতৃত্বের মিলনমেলা, ইসলামী ঐক্যের প্রতীক। এই ধরণের বিশ্ব সম্মেলন অন্য কোন ধর্ম ও জাতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। শুধুমাত্র মুসলিমরাই পৃথিবীর দিক-দিগন্ত থেকে ছুটে আসে ক্বাবার দিকে।

আরবের মক্কা নগরীতে প্রতি বছর জিলহাজ্ব মাসে ভাষা- বর্ণ, আরব-অনারব ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক কাতারে, একই রঙ্গের কাপড় পরিধান করে একই সুরে উচ্চারণ করেন, "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা, লাব্বাইক লা শারিক লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়ালামুলক, লা শারিকা লাক।"

অর্থাৎ, "আমি হাজির, হে আল্লাহ্! আমি হাজির, আপনার কোন শরিক নেই, আমি হাজির, নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামাত আপনারই। আর সমস্ত সাম্রাজ্যও আপনার, আপনার কোন শরিক নেই।"

মহানবী (সঃ) বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম ভাইভাই। তার জ্বলন্ত নিদর্শন হচ্ছে হজ্ব। এখানে সমস্ত ধরণের ভেদাভেদ ভূলে আরাফার ময়দানে একত্রিত হয়। মনে হয় যেন একই মায়ের সন্তান। তাঁরা একই ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করেন, একই স্রষ্টার নিকট মোনাজাত করে। হজ্বের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট হয়ে থাকে।

মুসলিমদের জীবনে হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। হজ্ব বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অন্যতম নিদর্শন। প্রতি বছর লাখ লাখ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসে আল্লাহ্র ঘর তাওআফ করার জন্য। একই কাতারে অংশগ্রহণ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাওআফ করেন আল্লাহ্র ঘর। আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকেনা হাজ্বীদের। এখানে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের চাওয়া পাওয়ার কোন হিসেব নিকেশ থাকেনা, বরং অর্থ ও পরিশ্রম বিসর্জন দিয়েই তাঁরা একত্রিত হয়ে থাকেন । সেজন্য কারও মনে কারও জন্য থাকেনা কোন হিংসে- বিদ্বেষ। শুধু থাকে ভালোবাসা আর ভ্রাতৃত্ব। যতদিন আল্লাহর ঘর এই জমিনের বুকে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততদিন মুসলমানের অস্তিত্ব টিকে থাকবে, যতদিন হজ্ব নামক এই ইবাদাতটি চালু থাকবে, ততদিন অটুট থাকবে এই ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুধা বিভক্ত মুসলিম জাতিকে বছরে অন্তত একবার হলেও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার

সুযোগ করে দেয় হজ্ব। আল্লাহ্ কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বিষয়টি, আর এই জন্যই ইবাদাত গুলোও ঐভাবেই সাজিয়েছেন যেন মুসলিমদের মধ্যে একতার সৃষ্টি হয়। জামাতের সাথে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, সপ্তাহে একবার জুমআর নামাজ, বছরে দুইবার জামাতসহ ঈদের নামাজ এবং হজ্ব উপলক্ষে বছরে একবার মক্কায় জড় হওয়া - সেই সবগুলোই মুসলিমদের মাঝে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে। আমরা দেখতে পারি- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমআর নামাজ এবং ঈদের নামাজ নির্দিষ্ট পাড়া-মহল্লা কিংবা দেশের মুসলিমদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টিতে অন্যতম ভুমিকা রাখে। ঠিক একই রকম ভাবে বিশ্ব মুসলিমদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টিতে হজ্ব অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে।

হজ্ব বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সহায়ক ত্যাগ, সমতা, ক্ষমা, পাপের প্রতি ঘৃণাসহ অসংখ্য কল্যাণকর কাজের প্রশিক্ষণ দেয়।

ত্যাগের প্রশিক্ষণ

হজ্ব আল্লাহ্ প্রেমিক প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষকে ত্যাগের প্রশিক্ষণ দান করে। আল্লাহ্র খলিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাইল (আঃ) ও হাজেরা (আঃ) এর ত্যাগ-তিতিক্ষা, কুরবানি, আত্মসমর্পণ ও অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুমহান ঐতিহ্য প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়কে ত্যাগের পথে অনুপ্রানিত করে।

সমতার শিক্ষা

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অন্যতম একটি অন্তরায় হল অসমতা। হজ্বের মাধ্যমে অসমতা দূর হয় এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাদা-কালো ও নানাদেশের নানাভাষী মানুষ ইহরাম অবস্থায় সব ভেদাভেদ ভুলে সাদা কাপড় পরিধান করে একই কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইবাদাত করার এই নিয়ম হাজ্বীদের মহব্বত ও অভিন্নতার শিক্ষা দান করে।

ক্ষমার শিক্ষা

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আরেকটি অন্যতম অন্তরায় হল নির্দয়তা বা একে অপরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে না দেখা। বায়তুল্লাহর যিয়ারত, আরাফা, মিনা, মুজদালফা ইত্যাদি পবিত্র স্থান জিয়ারতের মাধ্যমে হজ্ব পালনকারী আল্লাহ্র নিকট মাগফিরাত ও তওবা করার সুযোগ লাভ করে থাকে। পবিত্র স্থানগুলোতে দোয়া কবুল করে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ববাসীদেরকে শুধু ক্ষমাই করেন না বরং তাদের অন্তরে সহানুভূতির বিজ বপন করে ক্ষমার শিক্ষা দান করে তাদের চিন্তা চেতনাকে উন্নত করে।

পাপের প্রতি ঘৃণা

একজন বিশ্বাসীর অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেনা। ইমানদার ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতেই হবে "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু।" (সূরা তওবাহ-৭১)

হজ্ব পালনের মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের দ্বারা হাজ্বীদের মধ্যে পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মায় এবং পাশাপাশি ভেদাভেদ ভুলে সকলকে ভালোবাসার গুন তৈরি হয় যা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অন্যতম উপদান।

দুঃখের বিষয় মুসলমানরা হজ্বে গিয়ে ভ্রাতৃত্বের অনন্ত নজির স্থাপন করলেও নিজ নিজ দেশে তারা নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে আছে। এক মুসলিমের নিকট অপর মুসলিমের জীবনের নিরাপত্তা নেই। ক্ষমতার মোহে হত্যা করছে একে অপরকে, সম্পদ ও সম্মানহানি করছে একে অপরের। অথচ এই হজ্বের ভাষণেই রাসুল (সঃ) ঘোষণা করেছেন, 'আজকের এই দিন, এই স্থান এবং এই মাস যেমনভাবে তোমাদের কাছে পবিত্র তেমনভাবে তোমাদের নিকট একে অপরের জীবন, সম্পদ ও সম্মান। বর্তমানে আমরা হজ্ব করি, কিন্তু এর শিক্ষাকে কাজে লাগাই না। আমরা আজ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করছি। অথচ দেখা যায় প্রতি বছর হাজ্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে হজ্বের মধ্যে একটি ইবাদাত কেন মুসলিমদের পারস্পারিক হানাহানি বন্ধে ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারছেনা? অবশ্যই পারত যদি আমরা হজ্বের শিক্ষা অন্তরে সবসময় পালন করতে পারতাম। আমাদের দলীয় গোঁড়ামি

☞☞☞পরবর্তী অংশ ৩৫ নং পাতায়

স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহীদ শের আলী খান

নয়ন চৌধুরী

বড় লাটকে হত্যা করে ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েও যিনি স্থান পাননি ইতিহাসের পাতায়!

"এবারের বিদায় দে মা ঘুরে আসি,
হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী!"

এই গানটির সাথে অপরিচিত এমন কাউকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়না। ইংরেজ বড় লাটকে হত্যার চেষ্টাকারী ক্ষুদিরামের স্মরণে লিখিত গানটি সবাই গেয়ে থাকি, স্মরণ করি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের কথা।

কিন্তু কখনো কি শুনেছেন সেই মহান বীরের নাম যিনি বড় লাটকে হত্যা করে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভিত?

শুনেননি!

কেননা ইতিহাস রচনাকারীরা তাকে গোপন করেছে কারন তিনি ছিলেন মুসলমান!

জি হ্যাঁ!

শের আলী খান সেই অমর শহীদ যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বড়লাটের উপর আর তাকে হত্যা করেই সমাপ্ত করেছিলেন নিজের মিশন!

উপমহাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কোন ব্রিটিশ বড়লাটকে হত্যা করতে সক্ষম হন।

জন্মঃ-

শের আলি আফ্রিদি বা শের আলি খান খাইবারপাসের জামরুদ গ্রামে জন্মগ্রহণকরেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ (রাহঃ) এর শিষ্য।

কন্টকময় সংগ্রামী জীবন

ইংরেজ বিরোধী শীর্ষস্থানীয় নেতা মৌলানা জাফর থানেশ্বরী সহ অন্যান্য বিপ্লবীকে ধরিয়ে দেওয়া ও পুলিশের গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে হায়দার আলি নামক এক যুবককে হত্যা করার অপরাধে পেশোয়ার থেকে তিনি গ্রেপ্তার হন ১৮৬৭ সালে। বিচারে তার মৃত্যুদন্ড হয়। কলকাতা হাইকোর্ট আপিলে তাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দন্ডিত করে।

১৮৬৯ সালে যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত শের আলীকে আন্দামানে পাঠান হয় । তখন তাঁর বয়স ২৫ বছর এবং উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি । আন্দামান হচ্ছে সেই স্থান যাকে অনেকেই কুখ্যাত কালাপানির দেশ নামে চিনে।

আন্দামানে তখনো সেলুলার জেল তৈরি হয়নি। বন্দীদের বিভিন্ন দ্বীপে কঠোর পাহারায় রাখা হতো । পোর্ট ব্লেয়ারের হোপ টাউন অঞ্চলের পানিঘাটায় বন্দি ছিলেন শের আলি।

তিনি ছিলেন খুবই সরল , দয়ালু এবং ধর্ম ভীরু প্রকৃতির । জেলে মজুরি হিসাবে সামান্য যে পয়সা পেতেন তার সবটাই সহযোগী বন্দীদের মধ্যে বিলি করে দিতেন । এর ফলে বন্দীদের মধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন । অন্যদিকে দিন রাত একই চিন্তা , বিপদজনক নির্জন দ্বীপে নির্বাসন অবস্থায় অত্যাচারের বদলা কিভাবে নেওয়া যায় এবং দেশবাসীকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা যায় । ১৮৭২ সালে ৮ই ফেব্রুয়ারী সেই সুযোগ উপস্থিত হয় । অত্যাচারী বড় লাট লর্ড মেয়ো আসেন আন্দামান পরিদর্শনে। লর্ড মেয়োর পরিদর্শনের সংবাদ শুনে শের আলী খান তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেন অর্থাৎ যে ভাবেই হোক তাকে হত্যা করতে হবে । তিনি এটাও জানতেন তাঁকে দ্রুত আটক করা হবে এবং তাঁর মৃত্যু অবধারিত । তাই আগেই তাঁর হিন্দু মুসলিম সতীর্থদের কাছ থেকে বিদায় পর্ব সেরে নেন এবং তাঁর যে সামান্য অর্থ ছিল তা দিয়ে রুটি মিষ্টি

খাওয়ান। নির্ধারিত পরিদর্শনের দিন সকাল থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন । কিন্তু সুযোগ পেলেন না ।

অবশেষে ভাইসরয় মাউন্ট হ্যারিয়েট থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখে ফেরার সময় অন্ধকার নেমে আসে । সামনে আলো জ্বালিয়ে তাকে পথ দেখানো হচ্ছে এবং চারিদিকে উচ্চপদস্ত কর্মচারীবৃন্দ আর সশস্ত্র বাহিনী। ঠিক পিছনে আন্দামানের সুপারিন্টেনডেন্ট ওয়াকার । উদ্দেশ্য জেটির ধারে ছোট নৌকায় চেপে তার জন্য নির্ধারিত জাহাজ গ্লাসগো তে চড়া । হঠাৎ ওয়াকার অন্যজনের সঙ্গে কথা বলার জন্য পিছিয়ে পড়ে । সেই মুহূর্তে শের আলী খান বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন হাতের ছুরি দিয়ে ভাইসরয়ের পিঠে আঘাত করার সাথে সাথে ভাইসরয় লুটিয়ে পড়ে । তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ । ঐ আঘাতেই তার মৃত্যু হয় ।

সাথে সাথেই শের আলী খানকে গ্রেপ্তার করা হয় । পরের দিন দ্রুততম বিচার সম্পন্ন হয় । বিচারের সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয় তাঁর সঙ্গে আর কেউ ছিল কি না । সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে জানান তার একমাত্র সঙ্গী আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনি ভাই আব্দুল্লাহ (সৈয়দ আহম শহীদের রাহঃ আরেক শিষ্য) যেভাবে প্রধানবিচারপতি নরম্যানকে হত্যা করেছে তার থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েই তিনি এ কাজ করেছেন । তিনি প্রাণ ভিক্ষার জন্য কোন মার্জনা চাননি ।

১৮৭২ সালের ১১ই মার্চ তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। ফাঁসির দিন ফাঁসির দড়িকে চুমু খেয়ে সেই দড়ি পড়ে নেন এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এই কথা দুবার বলার পরই তাঁর শ্বাস রোধ হয়ে যায় । মাত্র ২৮ বছরেই থেমে যায় মহান এই স্বাধীনতাকামীর বিপ্লবী জীবন!

শের আলী খান জানতেন, তাঁর দেশকে স্বাধীন করতে তাঁকে চরম মূল্য দিতেই হবে । তিনি তা-ই দিয়েছেন । তবে শের আলী খানের জন্য রচিত হয়নি কোন শহিদ বেদি, একটা শুকনো ফুলও কোন দিন কেউ দেয়নি , কোন কবি লিখেনি শোক গাঁথা, কোন সুরকার তুলেনি সুরের কোন করুণ মূর্ছনা, ইতিহাসের পাতার কোন এক কোণেও স্থান হয়নি স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান বীর শহীদের এটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি, এটাই সবচেয়ে বড় বেদনাদায়ক !!

তথ্যসূত্রঃ-

১) নারায়ণ সান্যাল (২০০৩)। শের-ই-শহীদ দ্বীপ। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর পা: লি:।

২) ক খ মুক্তির সংগ্রামে ভারত। কলকাতা: পশ্চিমবংগ বাংলা আকাদেমী। ১৯৯৬।

৩) "উনি 'বীর', আর বাকিরা?"। আনন্দবাজার পত্রিকা। সংগ্রহের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

৪) উইকিপিডিয়া

☞☞☞ ৫ নং পাতার পর

ক্ষেত্রেও আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন। মনের অবস্থাটাই আল্লাহর নিকট বিবেচ্য বিষয় হবে। তিনি বলেন,

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

"এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া।" (সূরা হাজ্জ: ৩৭)

শিক্ষা:

০১. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা দুনিয়ার অন্য সবকিছুর চেয়ে যেন বেশি হয়।

০২. যত কঠিনই হোক সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

০৩. শুধু মৌখিক ঈমানের দাবী যথেষ্ট নয়, বরং ধৈর্যের সাথে বাস্তব ময়দানে ইসলামের পথে অবিচল থাকতে হবে।

০৪. ঈমানেরর অগ্নি পরীক্ষা আসবেই।

০৫. ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন, পুরুষ্কৃত করেন।

০৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই যেনো হয় জীবনের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

বর্তমান সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের ভূমিকা

✍ জাসিয়া খাতুন

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের ভূমিকা আলোচনার পূর্বে দ্বীন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা অতীব প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কেননা দ্বীন আসলে কি তা আলোচনা করা প্রয়োজন। দ্বীন সম্পর্কে আমাদের মাঝে খুব কম বোনেরাই সঠিক জ্ঞান রাখেন । দ্বীন বলতে কেউ ভাবেন ধর্ম , আবার কেউ মনে করেন দ্বীন মানে নামায, রোযা, হজ্জ,যাকাত, ইত্যাদি। আসলে এগুলো সঠিক দ্বীনের ব্যাখ্যা নয়, এগুলো দ্বীনের এক একটি স্তম্ভ বা শাখা ।

দ্বীন ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্য স্রষ্টা প্রদত্ত একমাত্র নির্ভুল জীবনব্যবস্থা। স্রষ্টা প্রদত্ত এ নির্ভুল জীবনব্যবস্থা সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র সার্বিক কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা।

দ্বীন ইসলাম ছাড়া দুনিয়ায় যত ধর্ম, মত, পথ, ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে, সমস্ত মানুষের মনগড়া ধর্ম, মনগড়া মতবাদ। মানুষের মনগড়া ধর্ম, মনগড়া মতবাদ, কোনকালেই মানব জাতির কোন কল্যাণ দিতে পারেনি, এখনো পারছে না, আর কোনকালে পারবেও না।

বরং মানব রচিত এসব মনগড়া ধর্ম, মনগড়া মতবাদ চিরকাল মানুষকে শোষণ করেছে, নির্যাতন করেছে ও অত্যাচার করেছে। একমাত্র স্রষ্টাপ্রদত্ত ইসলাম তার ব্যতিক্রম।

বর্তমানে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকায় বিশ্ব অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে চলেছে। এই অন্ধকারময় পৃথিবীকে আলো দেখাতে অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ সাধারণত পুরুষদের করতে দেখা যায় কিন্তু আমরা যদি অতীত দেখতে যায় তো পাবো যে মহিলারাও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অনেকসময় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই দায়িত্ব পালন করেছেন সরাসরি নাবী-রাসুলদের নেতৃত্বে। বর্তমানেও যদি ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসাবে, তাহলে অতীত যুগের মতো নারীদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে পুরুষদের পাশাপাশি।

বর্তমানে আমাদের সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই, শুধু এতটুকুই নয়, বরং ইসলামের যেটুকু বেঁচে আছে তাও উৎখাত করার ষড়যন্ত্র চলছে, আর এ ক্ষেত্রে মেয়েরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বা মেয়েদেরকেই বেশী ব্যবহার করছে।

ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে মেয়েদের সক্রিয় থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের প্রচলিত সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা। ওয়াজ মাহফিল থেকে শুরু করে সেমিনার সিম্পোজিয়াম যা কিছু ইসলামী আলোচনা হয় তার বেশীরভাগটাই পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলারা ইসলামের আলোকোজ্জ্বল পথে ধাবিত হতে পারেনা।

রাসুলের যুগেঃ- ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যেসব নারী জীবনের মায়া ত্যাগ করে সোনালি ইতিহাস গড়ে গেছেন, তাদের অনুসৃত পথেই বর্তমানের নারীদের চলতে হবে। রাসুলের যুগে ইসলামের প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করছিলেন মহিলা সাহাবী সুমাইয়া (রাঃ)। হযরত খাদিজা (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) সহ আরও অসংখ্য মহিলা সাহাবীদের আমরা দেখতে পায় যাদের ত্যাগ তিতিক্ষা আর অবদান ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা করেছে।

বর্তমান যুগেঃ- এতো গেলো নাবী (সঃ) এর স্বর্ণযুগের কথা। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পায় যে, এ সমাজেও এই ধরণের মহিলার অভাব নেই যারা ইসলামকে নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন এবং এর

জন্য যেকোনো কুরবানী করতেও পিছপা হননি।

উদাহরণস্বরূপ- মিশরের হামিদা কুতুব, আমিনা কুতুব, জাইনাব আল গাজালি ইত্যাদি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়। হামিদা কুতুব এবং আমিনা কুতুব ছিলেন শহীদ সাইয়েদ কুতুব এর বোন এবং আরবী সাহিত্যের অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম জনগণকে জাগ্রত করার অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন। কারাগারেও ছিলেন সত্যসেবী ভাইয়ের সাথী। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে! মিশর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কারাবাসকেও তাঁরা বরণ করেছেন। মোটকথা, ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও অনেক অবদান রয়েছে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রথমত প্রয়োজন জ্ঞানার্জন এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল-

জ্ঞানার্জনঃ-

ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার এই মহান দায়িত্ব নারী পুরুষ উভয়ের জন্য। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন জ্ঞানার্জন।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ-

"আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাকে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে আর যে ব্যক্তি এ সত্যটির ব্যাপারে অন্ধ, তারা দু'জন সমান হবে, এটা কেমন করে সম্ভব? উপদেশ তো শুধু বিবেকবান লোকেরাই গ্রহণ করে।" (সূরা রদ - ১৯)

ইসলামে জ্ঞানার্জন ফরজ। রাসুল (সঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রথম কথা 'পড়' এবং এই কথাটিকে অনির্দিষ্ট না করে "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন" কথাটি জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ জ্ঞানার্জন করতেই হবে তবে তার মূল ভিত্তি হবে আল্লাহ্ সম্পর্কে জানা।

এই জ্ঞান আমরা পেতে পারি তিনটি সুত্র থেকে-

১) কুরআনঃ- কুরআনই হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের প্রধান উৎস। এটা আল্লাহ্‌র বানী। মানুষের জন্য করনীয় যাবতীয় জীবন বিধান আল্লাহ্‌পাক এই পবিত্র গ্রন্থে দিয়েছেন।

সূরা আলে ইমরানের ১৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে "এটি মানব জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।"

এভাবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহপাক ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য ও বিধিনিষেধ গুলো বর্ণনা করেছেন যা একজন দায়ী হিসাবে আমাদের সকলকে জানা প্রয়োজন।

২) হাদীসঃ- ইসলামের বিধি-নিষেধ জানার ক্ষেত্রে কুরআন পাঠের সাথে সাথে হাদীস পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে আমরা নাবী (সঃ) এর বাস্তব জীবন এবং জীবনের খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে জানতে পারি। হাদীস হল কুরআনের ব্যাখ্যা এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে রাসুল (সঃ) কর্তৃক উপস্থাপিত বাস্তব দিক।

৩) ইসলামী সাহিত্যঃ- কুরআন হাদীস অধ্যায়নের পাশাপাশি সাহিত্য পাঠও দ্বীন ইসলামকে ভালোভাবে বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জন্য দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ করতে হলে বিভিন্ন মনিষীদের লেখা সাহিত্যগুলোও অধ্যায়ন করতে হবে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের মেয়েরাও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন না। আয়েশা (রাঃ) এর নাম এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি ছিলেন মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা কারী এবং অনেক সাহাবীকে হাদীসের শিক্ষাও প্রদান করেছিলেন।

আমলঃ-

দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ করার প্রাথমিক শর্ত হল অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল। আমলহীন জ্ঞান ও ঈমান মানুষের কোন কাজে আসবেনা।

বর্তমান সমাজে ইসলামী আন্দোলনের একজন মহিলা কর্মীর কাজগুলো আমরা নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করতে পারিঃ-

১) নারী সমাজে ইসলামের সঠিক ধারণা দানের কাজ নারীরাই ফলপ্রসূভাবে করতে পারে তাই আমাদের

☞☞☞পরবর্তী অংশ ৩৫ নং পাতায়

বোন তুমি পর্দা করো...

✍ মারিয়াম

বোন তুমি পর্দা করো, মাদ্রাসায় পড়াশুনা করো, অনলি সিস্টার আইডি চালাও, ঈমানী পোস্ট করো, দ্বীনি ইলম আছে তোমার, তাই বলে ওদেরকে অবজ্ঞা করোনা। যারা নিজেকে পর্দায় জড়াতে পারেনি, যারা দ্বীনি ইলম অর্জন করতে পারেনি।

বোন ওরাও তো আমাদের স্বজাত, ওরাও তো নিপুণ স্বপ্ন দেখে, ওরাও সুস্থ পরিপাটি একটা জীবনের কল্পনা করে। ওরা আছে বলেই আল্লাহ তোমাদের মতো বোনদের কাঁধে অনেকখানি দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে, তোমার জান্নাতে যাওয়ার যতগুলো উপায় আছে, তারমধ্যে এটা যে একটা উত্তম ধাপ।

আল্লাহর কোরআন, রাসুলের হাদীসে ওরা যে এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে। কোরআন, হাদীস মানতে হলে ওদেরকে যে দাওয়াত দিতে হবে, বুঝাতে হবে, ওরা অপমান করলে নিরবে সহ্য করতে হবে।

বোন যে মেয়েটি প্রাইমারী থেকে শুরু করে গ্রাজুয়েট কম্পিলিট করা পর্যন্ত প্রতিটি যায়গায় পড়েছে হাই, হ্যালো। সে কি করে অতি সহজে তোমাকে সালাম দিবে। যে মেয়ে সারা বছর ধরে শিখেছে, বন্ধুদের সাথে সেলফি মানেই আনন্দ, সে কি করে উত্তম ছবি নিজের প্রোফাইলে সেভ করবে । যে শিখেছে, আধুনিকতা মানে খোলামেলা, সে কি করে পর্দা করবে?

ওরা বাস্তব জীবনে হয়তো বা কখনোই দ্বীনের দাওয়াত পাইনি। তোমরা একদল পর্দানশীল মেয়ে যদি ভার্চুয়াল জগৎ এ ওদেরকে দাওয়াত দাও, ওদের সঙ্গ দাও। তবে ওরা নিশ্চয়ই তোমার উপদেশ একসেপ্ট করবে। দু লাইন ভাল কথা লিখে দাও, ওকে সাপোর্ট করো, তারপর যখন দেখবে, ওরা তোমার কথা শুনছে, তখন তাকে উপদেশ দাও। আগেই উপদেশ দিওনা, কারণ হুট করেই কেউ কখনও কারও উপদেশ গ্রহণ করেনা।

একটু একটু করে ইসলামের মধু ওদেরকে পান করাও, ওদের সাথে শ্রুতিমধুর কথা বলো, তোমাদের মতো দ্বীনবতী মেয়েরা যদি অহংকার করে, তবে ওরা শিখবে কার কাছে। ওরা যত বড়ই নায়িকা হোকনা কেন? যতই যৌন কাব্য পড়ুক না কেন? তবুও ওদেরকে অবজ্ঞা করোনা।

মারিয়া বর্গীয় যদি অ্যাওয়ার্ড পাওয়া পতিতা হয়ে, দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে বলতে পারে। THE MOST COMPASSIONATE ALLAH!!! UNTIL I DON'T GIVE ME

DEATH UNTIL YOU GET SATISFIED WITH MY SINS!!

(দয়াময় আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মৃত্যু দেবেন না, যতক্ষণ না আপনি আমার গুনাহ খাতা মাফ করে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান)

তোমার তো দ্বীনি ইলম আছে। তাই তোমার দায়িত্ব দাওয়াত দেওয়া। হেদায়েত তো মহান সত্তার হাতে। তুমি তোমার লিস্ট পর্দানশীল মেয়েদের দিয়ে সাজিয়েছো, কারণ ওদেরকে তোমার পছন্দ নয়।

তাহলে ওরা কাদের নিকট পছন্দনীয় হবে??? আমি মরিয়ম খুবই নগন্য ব্যক্তি, না আলেমা হতে পেরেছি, না এসএসসি পাশ করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি। সারাক্ষণ চেষ্টা করি আলেমাদের শরনাপন্ন হওয়ার যাতে দু-কথা জানতে পারি।

হে আলেমা সমাজ, হে সচেতন বোন, আমরা তোমাদের নিকট অনেক কিছু চাই না। কেন বোঝ না, আমাদের দুর্বলতা। কেন বোঝ না আমাদের না বলা হাজারটা কথা।

☞☞☞৩৩ নং পাতার পর

উচিৎ আমাদের নাগালের মধ্যে থাকা সমস্ত নারীকে ইসলামের সঠিক বার্তা বোঝানো।

২) একজন মহিলা দায়ী হিসাবে ইসালামের বাস্তব প্রতীক হতে হবে যাতে করে আমাদের ব্যবহার ও চরিত্রের মাধ্যমে অন্যান্য মুসলিম ও অমুসলিম মহিলারা ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়।

৩) যেহেতু বাড়ির পরিচালনা মহিলাদের হাতে সেহেতু বাড়ির পরিবেশকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে।

৪) সন্তানকে গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রধানত মায়ের। তাই একজন মহিলা দায়ী হিসাবে তাদেরকে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫) প্রতিবেশী মহিলাদের মধ্যে ইসলামী ভাবধারা উন্নতির লক্ষে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই রয়েছে সে দায়িত্ব পালনে সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

কাজেই আসুন বোনেরা, আমরা আমাদের দায়িত্বকে জেনে নিই এবং শরীক হয়ে যায় এমন এক ফরজ কাজে যার মধ্যে রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। মহান আল্লাহ্‌ আমদের সকলকেই যেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। আমীন।

☞☞☞২৯ নং পাতার পর

এবং অন্ধত্ব হজ্বের শিক্ষা বাস্তবায়নের অন্তরায় হয়ে দারিয়েছে।

তাই আমাদের উচিৎ হজ্বের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত না হয়ে চিরন্তন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। এখানেই দুনিয়াতে মুসলিমদের হজ্বের সার্থকতা। আর আখিরাতে হজ্বের সার্থকতা হচ্ছে জান্নাত লাভ। রাসুল (সঃ) এর বানিঃ 'কবুল হজ্বের সওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

☞☞☞১১ নং পাতার পর

ততটা কোন জিনিসের প্রতি লজ্জিত হইনা।" নবী (সঃ) বলেন, বাণী আদম (কিয়ামতের দিন) পাঁচটি বিষয় জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত এক বিন্দু নড়তে পারবেনা তার মধ্যে (১) পুরো জীবনকাল এবং (২) যৌবন কাল কি ভাবে কাজে লাগিয়েছে।" (তিরমিযি হা-২৪১৬)

২৫. সংঘবদ্ধ জীবন

মুমিনগণ পাল থেকে ছুট ভেড়ার মৃত ধ্বংসের মত জীবন পরিচালনা করবেনা। মুমিনগণ জামাত বদ্ধজীবনকে বেছে নিবে। কেননা "Unity is strength" (একতাই বল) এ মর্মে মহান রব বলেন "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আল ইমরান : ১০৩) এ মর্মে নবী (সঃ)এর বাণী "আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রশি তার গর্দান থেকে খুলে ফেলল।" (আহমাদ : ৪৭৫৮)

২৬. দায়ী ইলাল্লাহ

দ্বীন ইসলামের অন্যতম দায়ী হবে মুমিনগণ। সৎকাজের প্রসার ও অসৎকাজের উৎখাত করার লক্ষে দ্বীনের দাওয়াত অপরিহার্য। যুগে যুগে যত নবী-রসুলগন এসেছেন সকলেই দ্বীনের দায়ী ছিলেন। এ দায়িত্ব বর্তমান মুমিনদের উপর। এ মর্মে মহান রবের বাণী- "আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভালো কথা আর কার হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" (হামিম-আস সাজদাহ : ৩৩) "হে রাসুল! তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা লোকদের পৌঁছিয়ে দাও। তুমি যদি তা না করো, তবে তা পৌঁছিয়ে দেয়ার হক তুমি আদায় করলে না।" (আল মায়িদা : ৬৭)

কারওয়ানে উকাবের পাতা

আসসালামু আলাইকুম! ছোট্ট উকাব বন্ধুরা, তোমরা সব কেমন আছো? ভালো আছো! আলহামদলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি।আচ্ছা বন্ধুরা ,এখন লকডাউন চলছে তাইতো । আমার ছোট্ট উকাব বন্ধুরা !এটা কিন্তু আমাদের একটা সুবর্ণ সুযোগ পড়াশুনা করার।এই সময়টা যেন আমরা টিভি দেখে,গেম খেলে নষ্ট না করি ঠিক আছে।এই সময়টা আমাদের কাজে লাগাতে হবে ।আর আমাদের কাছ থেকে "ঈদ-উল-ফিতর "বিদায় নিয়েছে আমাদের সামনে আর একটা উৎসব আসছে "ঈদুল আযহা "।

আর একটা কথা, এখন অনেকে বন্ধুর ফাঁদে পরে বেকার হয় যাচ্ছে এই জন্য আমাদের সৎ বন্ধু নির্বাচন করতে হবে বুঝলে বন্ধুরা। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বলেছেন যে,"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সহযোগী হও"(সূরা তওবা - ১১৯)। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে যেন সঠিক বুঝ দান করেন। আমীন।

মোহাঃ হানজালা শেখ
রাজ্য কারওয়ানে উকাব সেক্রেটারি

বলো দেখি

১) প্রথম নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি? ২) হুদায় বিয়ার সন্ধি কত সালে হয়? ৩) পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই নিয়েছেন- কোন সুরার কত নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে? ৪) সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর কাকে বলা হয়? ৫) কুরবানী শব্দের অর্থ কী? ৬) পৃথিবীর কোন নদীকে শান্তির নদী বলা হয়? ৭) ইতিহাসের জনক কে? ৮) ইন্টারনেটের জনক কে? ৯) ভারতের শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন? ১০) বাবরী মাসজিদ কত সালে ধ্বংস করা হয়?

প্রিয় কারওয়ানে উকাব বন্ধুরা, পত্রিকা দপ্তরে তোমাদের উত্তর লিখে পাঠাও। পাঠানোর সময় নিজের মোবাইল নম্বর, ক্লাস এবং ঠিকানা উল্লেখ করতে ভুলবেনা। 9635717159 নম্বরে SMS করে বা Whastapp- এ পাঠাতে পারো। ভাগ্যবান প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে ইনশাআল্লাহ্ ।

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নামঃ-

১। জুবায়ের (নবম শ্রেনী)- মালদা
২। সাইদ জাকি (অষ্টম শ্রেণী) - মিরচক, মালদা
৩। মোহাঃ আব্দুল নাসের (অষ্টম শ্রেণী), হাউস নগর, মুর্শিদাবাদ

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর

১। রমাযান মাস, ২। সূরা আল ক্বদর, ৩। ২৫ নং সূরা, ৪। নুর ইসলাম, ৫। কারওয়ানে উকাব নামক বিভাগীয় পৃষ্ঠায়, ৬। আঙ্কারা, ৭। সাদা গলা যুক্ত মাছরাঙ্গা, ৮। মালদা জেলায়, ৯। নাউরু, ১০। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ।

বিবেক মুক্ত জীবন

আবু মুসা

আমি আমার বিবেকের গলায় চাপ দিয়ে হত্যা করেছি,
আজ আমি বিবেকহীন একটা প্রাণী ।
আজ আর আমার কোনো বিবেক বেঁচে নেই !
বিবেক আমার মরে গেছে,
স্বার্থপরতা একটা শূণ্য জীবন পরে আছে ।

মা মরে গেছে কবে কখন সেটাও ভুলে গেছি,
বাবার মৃত্যু সেটাও ভুলে গেছি
নিজের জন্মদিন সেটাও ভুলে গেছি,,,,,,
একদিন কোথায় ছিলাম আমি,
কোথা থেকে এসেছি ?
এত বিখ্যাত কার জন্য হতে পেরেছি ?
সেটাও ভুলে গেছি ।
আজ আমি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতাটুকু
জানাবার ভাষা পযন্ত হারিয়ে ফেলেছি ।

তবে আমার একটা বিশেষ দিন,
তবে এইদিনটা খুবই বিশেষ,
তাই হাজার রক্ত ক্ষত বিনয়ের মঝে সেটা ঠিক
মনে রেখেছি ।

এইতো বেশ ভালো আছি,
একটা বিবেকহীন জীবন নিয়ে বেঁচে আছি ।

আঁড়ালে অভিভাবক

মাহফুজ

পৃথিবীর বুকে আমি যবে এসেছি,
নিজের জীবন খুব ভালবেসেছি ।
একে একে বড়ো হয়ে গড়েছি জীবন;
লেখাপড়া সফলতায় করেছি বরন ।
জন্মের পর হতে বর্তমান কাল _
অভিভাবকের ফলে মোর এ সুহাল ।
নিজে হতে কোন কিছু পারিতাম নাহি ,
হৃদয়ের মন থেকে তারি গান গাহি ।
আমার সফল ফলের তারি গুন মূল ;
আর তার নাহি কেহ মোটেই সমতুল ।

এই দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছে বলে
জনস্রোতের মাঝে বেড়াই যে চলে ।
নিজ গুনে শিখিয়েছে আপনার জ্ঞান;
অথচ তারি মোরা নাহি দিই ধ্যান ।

কুরবানি

হায়দার সেখ

কুরবানি মানে তো শুধু পশু জবাই নয়
কুরবানি মানে তো ত্যাগের পরিচয় পাই ।
কুরবানির ত্যাগে নিজেকে বিলিয়ে
ইব্রাহিম(আ:) হয়েছে পার ।
আমরা হতভাগা পাপী মানুষ
ত্যাগী হতে পারিনা আর ।
নিজ ছেলেকে ফেলেছে জমিনে
দিয়েছে গলায় ছুরি ।
ত্যাগের সীমা মহৎ তাঁহার
তাঁহাকে ছুঁতে নাহি পারি ।
হাজারো পাপের পাপী মোরা
হৃদয়ে নেই আল্লাহর ভয় ।
সারাক্ষন অপকর্মে রই
এই কুরবানিতো আমাদের নই ।
ত্যাগ করো তুমি
সকল অপকর্মের ভূমি ,
তওবা করে নাও
ফিরে এসো , সত্যকে চুমি ।
তবে তোমার কুরবানি
হবে সার্থক জানি ।
বলেছেন,বিশ্বজাহানের মালিক
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ।

ইফতার কিটস বিতরণ

উত্তর ২৪ পরগণার IYF মারাকপুর সার্কেলের উদ্যোগে এলাকার দরিদ্র, দুঃস্থ অসহায় মানুষদের রমাযান মাসে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় রমাযান অর্থাৎ ১৫ই এপ্রিল মারাকপুর সার্কেল প্রেসিডেন্ট ফারুক মণ্ডল এবং ক্যাশিয়ার মনিরুল ইসলামের তত্বাবধানে ৩৩টি পরিবারকে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আগামী বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আরও বেশী করে দেওয়ার সঙ্কল্প করেন তারা, যাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হন।

বিড়ায় অনুষ্ঠিত ইফতার মাজলিস

IYF উত্তর ২৪ পরগণার লক্ষীপুল সার্কেলের উদ্যোগে বিড়া চৌমাথায় একটি ইফতার মাজলিসের আয়োজন করা হয়। গত ২৫ শে এপ্রিল রবিবার বিকেলে রাজ্য কারওয়ানে উকাব সেক্রেটারি জনাব হানজালা শেখের সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত ও অনুবাদের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির শুভারম্ভ ঘটে। সিয়াম সাধনার প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা রাখেন ডঃ আবু দাইয়ান সাহেব।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় ৭০ জন ছাত্র-যুবক।

রমাযানে কুরআন খতম উপলক্ষে বিভন্ন ব্রাঞ্চ ও সার্কেলে কারওয়ানে উকাব সদস্যদের পুরষ্কার বিতরণের কিছু চিত্র

চকসাপুর সার্কেল

হাউস নগর সার্কেল

চাচন্ড ১ ব্রাঞ্চ

কাঁকুড়িয়া ব্রাঞ্চ

জেরুজালেমে দূতাবাস স্থাপন করবে হন্ডুরাস

আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন করে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় জেরুজালেমে দূতাবাস খুলতে চলেছে সেন্ট্রাল অ্যামেরিকান দেশ হন্ডুরাস । জানা গিয়েছে তেল আবিবে কয়েক দশক থাকার পর জেরুজালেমে তাদের দূতাবাস স্থানান্তরিত করা হবে।

রাষ্ট্রসংঘে ভোটাধিকার হারাল ইরান

বার্ষিক চাঁদা দিতে না পারায় রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভোটাধিকার হারাল ইরানসহ ৪ আফ্রিকান দেশ। এর প্রতিবাদে এক চিঠিতে রাষ্ট্রসংঘকে একহাত নিয়ে তেল আবিব অ্যামেরিকার অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে দায়ী করেছে। উল্লেখ্য যে, কোন দেশ রাষ্ট্রসংঘে লাগাতার দুইবছর চাঁদা না দিলে 'সাধারণ পরিষদে' তার ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।

১০ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে ইসরাইল!

১৯৬৭ সালে সংঘটিত আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে ইসরাইলের খুনি সেনাবাহিনী। এ সময়ের মধ্যে ২২৬ জন বিনা চিকিৎসায় কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছে। এমনই তথ্য প্রকাশ করেছে 'ডিটেইনি অ্যান্ড এক্স ডিটেইনি' নামক একটি সংস্থা। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে যে, বর্তমানে প্রায় ৪ হাজার ফিলিস্তিনি ইসরাইলি কারাগারে বন্দি রয়েছে।

চীনের বিতর্কিত এক সন্তান নীতি

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চীনের 'এক সন্তান নীতি' বহুল আলোচিত একটি বিষয় যা চালু হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। দীর্ঘ ৪০ বছর বহাল থাকার পড় ২০১৬ সালে নতুন করে ঘোষিত হয় 'দুই সন্তান নীতি'। কিন্তু তাতেও মিটেনি সমস্যা। পরিবার পরিকল্পনায় সমস্যার কারনে চীন আবার 'তিন সন্তান নীতি' ঘোষণা করেছে সম্প্রতি। মোদ্দাকথা, আল্লাহ্‌র আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 'লিঙ্গানুপাত' যে ঠিক রাখা যায় না তার বাস্তব উদাহরণ হতে চলেছে চীন।

ইসরাইলি বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করল সৌদি

ইসরাইলের বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করল সৌদি আরব। গত ২৫ শে মে কার্যত আচমকা এই সিধান্ত নেই সৌদি সরকার। সৌদি আরব তার আকশসীমা ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত এমন সময় নেয় যখন ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে ১১ দিনের রক্তক্ষয়ী ভয়াভহ সংঘর্ষের পরে ইসরাইল যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

আমেরিকায় ইসলাম ধর্মের ব্যপক প্রসার

সম্প্রতি প্রকাশিত "দ্য আমেরিকান মস্ক ২০২০ গ্রোয়িং অ্যান্ড ইভলভিং" শীর্ষক এক সমীক্ষায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকাতে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে মুসলিমদের সংখ্যা। সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুসারে ২০১০-২০২০ সালের মধ্যে মাসজিদের সংখ্যা বেড়েছে ৩১ শতাংশ, মুসল্লিদের সংখ্যা বেড়েছে ১৬ শতাংশ।

পাথেয়

আল্লাহ সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর কুরবানী ওয়াজিব করেছেন। তবে আমরা যদি কুরবানী বলতে শুধু পশু-জবাই বুঝি, তাহলে ভুল করবো। কুরবানী শুধুই পশু জবাই নয়। ইসলামের অন্যান্য ইবাদতের মত কুরবানীর মধ্যেও রয়েছে অনেক শিক্ষা। ফলে যেমন আমরা পশু-কুরবানী করার প্রতি গুরুত্ব দেই, তেমনি আমাদের কোরবানির শিক্ষার প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে। কুরবানীর নানা শিক্ষা ও তাৎপর্য রয়েছে। যেমন-

১) কুরবানী আমাদের ত্যাগ ও উৎসর্গ শিক্ষা দেয়। আমাদের উপর ইসলামের যে বিধানই আবশ্যক হোক, আমাদের পালন করতে হবে। আল্লাহর রাজি-খুশির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে। ইব্রাহীম আঃ প্রিয় সন্তানকে জবেহ করে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সুতরাং আমাদেরও, ইসলামের বিধান মানতে যত কষ্টই হোক, সহ্য করতে হবে। ইসলামের জন্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথাসম্ভব ত্যাগ স্বীকারের চেষ্টা করতে হবে।

২) কুরবানী আমাদেরকে ইসলাহে নিয়ত ও তাকওয়া শিক্ষা দেয়। আসলে নিয়ত ছাড়া সবকিছুই ভালো-খারাপ হতে পারে। নিয়তের গুণেই কাজ ভালো বা খারাপ হয়। আল্লাহ কুরবানীর বিষয়ে বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের পশুর রক্ত গ্রহণ করবেন না। গোশত গ্রহণ করবেন না। গরু বা ছাগল যত বড়ই হোক, সেইটা গ্রহণ করবেন না। গ্রহণ করবেন তাকওয়া, সহি নিয়ত। সুতরাং আমাদেরও প্রতিটি কাজে নিয়ত সহি করতে হবে। কাজ যতই ছোট হোক, অবশ্যই, নিয়ত সহি করতে হবে।

৩) কুরবানী আমাদেরকে সাম্য, সামাজিকতা ও আলাপ-আলোচনা করতে শিক্ষা দেয়। আসলে আমরা যেমন বলেছি, ইসলাম ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তো, ইসলাম কীভাবে সমাজ পরিচালনা করতে চায়? সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলাম সাম্য, সামাজিকতা ও আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব দেয়। কেননা এই সুযোগ না দিলে, পরিণামে ব্যক্তিতন্ত্র কায়েম হয়। অথচ ইসলাম বলে, সবাই আল্লাহর বান্দা, আর কারো বান্দা নয়। অতএব, আল্লাহর সাথে মানুষের বন্দেগির সম্পর্ক, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ভাতৃত্বের।

ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাইল (আঃ) কে জবেহ করার বিষয়ে দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি নবী, আদেশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তবুও, প্রয়োগের আগে তিনি ছেলের অনুমতি নিয়েছেন "বাবা আমি তো স্বপ্নে দেখেছি, আল্লাহ আদেশ করেছেন, যাতে তোমাকে জবাই করি, তুমি কি বল বাবা?" এই তো দায়িত্বশীলদের অধীনস্তদের সাথে সম্পর্ক, অনুমতি ও পরামর্শ! হাদিসে আছে, প্রথমে কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশী জমিয়ে রাখার অনুমতি ছিলোনা। কেন ছিলোনা? যাতে মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়বোধ গড়ে উঠে, নিজের ভাইকে ক্ষুধার্ত রেখে আপনি যে খেতে পারবেননা, এই শিক্ষা দেবার জন্যই তিনদিনের বেশী জমিয়ে রাখার অনুমতি ছিলোনা। পরে যখন সবার মধ্যে সামাজিক সাম্য ও দায়িত্ববোধ গড়ে উঠে, তখন, বেশীদিন জমিয়ে রাখার অনুমতি দেয়া হয়।

আমাদের খেয়াল রাখা জরুরি, যেহেতু, ইসলাম ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই, সামাজিক যোগাযোগ,সম্পর্কে এবং দায় ও দায়িত্ববোধে ইসলামের শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরি। আপনার সমাজ যদি ঠিক না থাকে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে জুলুম সৃষ্টি হয়, তাহলে অবশ্যই আপনাকে এর দায়ভার নিতে হবে।

তাই আসুন কুরবানীর শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। কেননা শিক্ষা গুলো যদি বাস্তবে প্রয়োগ না করি তবে প্রতি বছর কুরবনী আসবে-যাবে, কিন্তু উম্মাহর অবস্থার কোন পরিবর্তন হবেনা।

Satyabaak May-June, 2021

PALESTINE 1917-TODAY

BALFOUR ▶ NAKBA ▶ OCCUPATION

Published by Md Alamgir Hossain on Behalf of Islamic Youth Federation,
3B, Crescent Apartment, 2nd Floor, Hatiara, Kolkata-700157
Editor- Saber Bin Yeasin, Mobile- 8918734921
Email:- satyabaakwb@gmail.com

দখলদার ইহুদিবাদী ইসরায়েলের গাজায় আক্রমণ, ফিলিস্তিনিদের জানমালের ক্ষতি এবং শক্তিশালি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের কিছু দৃশ্য